KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন, 202 রাসবিহারী এভিনিউ
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 12/2 15/2 15/3 17/2 18/2	Year of Publication : Dec 1946 March 1950 (বৈশাখ ১৩৫৭) Dec 1952 Feb 1954
	Condition : Brittle ✓ / Good ✓
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

সম্পাদক

বুদ্ধদেব বসু

পৌষ
১৩৫৩

*

চার টাকা

কবিতা ভবন

কবিতা

পৌষ ১৩৫৩

= এই সংখ্যায় =

কবিতা

অশোকবিজয় রাহা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, শক্তি মুখোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণা দত্ত, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, পরিমল রায়, বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু

অনুবাদ

তাও ইউয়ান-মিং - - - অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবন্ধ

'মাইকেল'

আলোচনা

বাংলা ছন্দ - - - তাপসকুমার ভৌমিক

সমালোচনা

নরেশ গুহ

কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র। বর্ষারম্ভ আশ্বিনে। আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়ে প্রকাশিত। বার্ষিক চার টাকা, বর্মায় চার টাকা চার আনা, প্রতি সংখ্যা এক টাকা। ★ 'কবিতা'র গ্রাহক হ'তে হয় আশ্বিন থেকে—মনি-অর্ডরে বার্ষিক চাঁদা পাঠিয়ে কিংবা ভি.পি.তে। ষাণ্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। সমস্ত চিঠিপত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করা আবশ্যিক। ★ প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাতে হ'লে ঠিকানা-লেখা টিকিট-লাগানো খাম সঙ্গেই দেবেন—নয়তো পরে আর সম্পাদকের সিদ্ধান্ত জানানো সম্ভব নয়। নিজের কাছে প্রেরিত রচনার অনুলিপি রাখা সব সময় বাঞ্ছনীয়। ★ সুসংস্কৃত বিত্তশালী বাঙালি ও ছাত্রসমাজে প্রচারের পক্ষে 'কবিতা' একটি উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন-বাহন। বিজ্ঞাপনের মূল্য-পঞ্জী চিঠি লিখলে পাঠানো হয়। ★ 'কবিতা'ই একমাত্র পত্রিকা, যাতে কবিতাভবনের সমস্ত বই, পত্রিকা ও পুস্তিকার বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রকাশিত হয়, অতএব কবিতাভবনের সঙ্গে অক্ষুণ্ণ যোগাযোগ রাখতে হ'লে 'কবিতা'র গ্রাহক হওয়াই শ্রেষ্ঠ উপায়।

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা ২৯

পুরোনো সংখ্যা 'কবিতা'

'কবিতা'র নিম্নলিখিত পুরোনো সংখ্যা এখনো পাওয়া যাচ্ছে :

চৈত্র	১৩৪৩
পৌষ	১৩৪৪
চৈত্র	১৩৪৪
আষাঢ়	১৩৪৫
আশ্বিন	১৩৪৫
চৈত্র	১৩৪৫
আশ্বিন	১৩৪৬
পৌষ	১৩৪৬
আষাঢ়	১৩৪৭
চৈত্র	১৩৪৭
আষাঢ়	১৩৪৮ (রবীন্দ্র-সংখ্যা)
আশ্বিন	১৩৪৮
কার্তিক	১৩৪৮
পৌষ	১৩৪৮
চৈত্র	১৩৪৮
পৌষ	১৩৪৯
চৈত্র	১৩৪৯
আশ্বিন	১৩৫০
আষাঢ়	১৩৫০
কার্তিক	১৩৫০
পৌষ	১৩৫০
আষাঢ়	১৩৫১
কার্তিক-পৌষ	১৩৫১ (নজরুল সংখ্যা)
চৈত্র	১৩৫১
আষাঢ়	১৩৫২

প্রতি সংখ্যা এক টাকা,
রবীন্দ্র-সংখ্যা দু' টাকা।
একাদশ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যায়।

তিন টাকা।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র

কবিতা

দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা] পৌষ, ১৩৫৩ [ক্রমিক সংখ্যা ৫২

চিরজয়ী

অশোকবিজয় রাহা

এ-কণ্ঠের বাণী
জানি আমি জাগে আজ সৃষ্টির সে আদি-উৎস হ'তে—
উঠেছিল অগ্নিমেঘ, উঠেছিল নীহারিকা-ঝড়
ঝরেছিল উল্কাবৃষ্টি—জেগেছিল কোটি সূর্যতারা
জেগেছিল জ্বলন্ত পৃথিবী
উত্তপ্ত লাভার স্রোত সর্বদেহে ঢেলেছিল তার
কোটি অগ্নিগিরি।

কত যুগ পরে
ধীরে-ধীরে বাষ্পমেঘ স'রে
দেখা দিল নূতন পৃথিবী
দেখা দিল জল স্থল—দেখা দিল অরণ্য বিশাল
দেখা দিল প্রথম জীবন।

আদিম অরণ্যতলে দেখেছি সেদিন্
আদিম রাত্রির বিভীষিকা
বিকট হিংসার মূর্তি কৃষ্ণ-ভয়ঙ্কর
অন্ধকারে হিংস্র চোখ জ্বলে—

তীক্ষ্ণ নখে রক্ত মাখা, তীক্ষ্ণ দাঁত শাণিত প্রখর।
সে ভয়াল মহারণ্যে এক প্রান্তে জ্বেলেছি সেদিন
অগ্নিশিখা কম্পিত উজ্জ্বল
আপন অভয়মন্ত্র প্রথম করেছি উচ্চারণ।

রাত্রি শেষে পূর্বসিন্ধুপারে
আরক্ত জবার মতো লাল সূর্য উঠেছে আকাশে,
উঠেছি সমুদ্র-স্নান ক'রে
সিক্তদেহে পূর্বাকাশে চেয়ে
আপন জীবন-সূর্যে করেছি বন্দনা,
আপনার কণ্ঠস্বর মন্ত্রমুগ্ধ শুনেছি সেদিন
দূরাগত সঙ্গীতের মতো।

সেদিন জীবনে
জন্ম নিল সুন্দরের কবি
জন্ম নিল প্রেম,
উজ্জ্বল রূপের বন্যা ব'য়ে গেলো অন্তরে-বাহিরে
ছুটালো রঙের ঝড় সূর্যাস্তের মেঘে
পাখা মেলে উড়ে এলো অপরূপ তারা-ভরা রাত
সমুদ্রে পাহাড়ে বনে ছড়ালো চাঁদের স্বপ্নলোক।

আমার এ-কণ্ঠে আজ কথা কয় প্রকাণ্ড অতীত
কথা কয় বোবা মাটি-জল
লুপ্ত যুগ, লুপ্ত জনপদ
অতীতের গুঞ্জন-মুখর
শত-শত বিলুপ্ত নগর

সারি-সারি অন্ধ গিরিগুহা,
গম্বুজ, খিলান
কোটি ভগ্নচূড়া।

দীর্ঘ জীবনের পথে কত দীর্ঘ অন্ধকার রাত
জ্বলন্ত মশাল হাতে ছুটেছি উন্মাদ
উদ্দাম ঘোড়ার পিঠে।
কত বন, মরুভূমি, কত গিরিপথ
ছাড়ায়ে এসেছি পিছে,
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা আর ক্রুত অশ্বখুরে
কত মৃত্যু হ'য়ে গেছি পার,
উন্মাদ গতির ঝড়ে চক্ষের পলকে
ঘটায়েছি কত-যে প্রলয়!
তারপর দীর্ঘ রাত্রিদিন
কী কঠিন তপস্যা করেছি!
বিরাট ধ্বংসের বুকে নিজ হাতে তিল-তিল ক'রে
আবার নূতন সৃষ্টি গড়েছি অতন্দ্র সাধনায়।

জানি আজ আমার এ বুদ্ধিদীপ্ত মনীষার আলো
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কী আশ্চর্য বিস্ময় ছড়ালো,
জড়ায়েছে সপ্তলোক যন্ত্রের বিচিত্র মায়াজালে
এ-সৃষ্টির যত শক্তি বন্দী আজ হাতের মুঠোয়,
আমার ইঙ্গিতে আজ এ-বিশ্বের অণু-পরমাণু
মুহূর্তে চঞ্চল!
কোটি-কোটি জ্যোতি-কণা মুহূর্তে সে অণুনৃত্যে মাতে,

চক্ষের পলকে
বস্তু-সমুদ্রের বুকে ঝড় ওঠে প্রচণ্ড উত্তাল।
প্রতিভার দীপ্ত সূর্য জাগে আজ আমার ললাটে
উজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রে।

লোকজয়ী, কালজয়ী আমি,
তবু আজ জানি
আমার দুর্জয় শত্রু আমারি সে আত্মঘাতী মোহ
আমাতেই জাগায় বিদ্রোহ,
আমার আপন সৃষ্টি আমাকেই বার-বার হানে,
চক্ষের পলকে
বিকট রাক্ষসমূর্তি ধ'রে
শত বজ্রে বক্ষ দীর্ণ করে
ছিন্ন হৃৎপিণ্ড হ'তে রক্ত ঝরে অযুত ধারায়,
বার-বার আমার এ জয়
ডেকে আনে ব্যর্থ পরাজয়।

তবু জানি, এ কখনো চিরসত্য নয়
আমার এ আত্মদ্রোহ একদিন হবে অবসান
সেই আদি আহিতাগ্নি জ্বলে আজ শত শিখা মেলে,
প্রাণসূর্য দিকে-দিকে ছড়ায়েছে সহস্র কিরণ।
আজ সেই জ্যোতির্ময় প্রেম
মেলেছে সহস্র দল মহাবিশ্বাকাশে
শত দ্বন্দ্বমৃত্যুমাঝে হাসে আজ আমার সুন্দর।

আমার এ-কণ্ঠে তাই আজ সেই দিব্যকণ্ঠ বাজে
যে-কণ্ঠে উদাত্ত হোলো চিরজয়ী জীবনের গান,

এ-কণ্ঠের বাণী আজ ঊর্ধ্বপথে ধায়
বিদ্যুৎ-পাখায়
সীমাহীন মহাশূন্যে—সাড়া জাগে তারায়-তারায়
এ-সৃষ্টির শেষপ্রান্ত কাঁপে সেই তরঙ্গ-আঘাতে
কাঁপে দূর নীহারিকা, কাঁপে দূর সূক্ষ্ম মহাকাশ
জীবনের জয়ধ্বনি-গানে।

'পরধন গীতিকা' অনুসরণে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

এই মাটির মাদল থেকে কী মিষ্টি গান
তুমি নিয়ে আসো গো !
বলো কেউ কি এমন গান আনতে পারে
এই দেহের মাদল থেকে মাটির ভাঁড়ে
যেন মধুর মতো ওগো গাইয়ে আমার !

ওগো গাইয়ে আমার নাও দু'হাত দিয়ে
নাও, দু'হাতে জড়িয়ে নাও শরীর আমার—
আরো একটু···আরো !
ওগো করো খেলা করো তুমি আমায় নিয়ে
করো আমার শরীরে খেলা শরীর দিয়ে !
আরো মাদলের মিঠে সুরে পাবে তুমি গান,
মিঠে চিনির মতো !

২

যদি বেসেছো ভালো
জাগো, সময় এলো !
দেখ, বিছানায় প'ড়ে আছে হীরার আলো ;
দেখ, আমার চোখেও আলো ঝলমলালো !
তুমি কোরো না দেরি, মিঠে লগন এলো—
যদি বেসেছো ভালো !

ওগো পাহাড় বেয়ে
তুমি উঠতে থাকো !
সেই উঁচুনিচু বাঁকা পথ দু'পায়ে মাখো।
সেই পথের শেষেই আছে সুখের পাওয়া—
এসো তাড়াতাড়ি, সুরু করো তোমার বাওয়া।
তুমি ক্লান্ত যখন নেমে আসবে শেষে
এসো, শুয়ে পড়ো ঝর্নার কিনার ঘেঁসে।
এসো ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসো স্বপ্ন-ছোঁওয়ায় এসো রাত্রি-শেষে !

আমি গেয়েছি কত
সেই কর্ম-গাথা ;
সেই নাচের বিভোল দলে জড়িয়ে যাওয়া ;
সেই গোল হ'য়ে হাতে হাত চাঁদের নিচে
ভালো- বাসার গানে ভালোবাসতে চাওয়া !
ওগো, দল বেঁধে বনে ফলকুড়োনো-ছলে
জানি, আমিও ছিলাম সেই মেয়ের দলে ;
সেই 'দাদারিয়া'-মিঠে গানে ঝড়ের মতো
আশা এই বুকে বাসা বেঁধে কেঁপেছে কতো।
তবু, তোমার সঙ্গে আজ এই যে বাওয়া—
জানি এর কাছে সব পাওয়া মিথ্যে-পাওয়া।

রোমন্থন

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

অতীত দিগন্ত থেকে স্মৃতির বাতাস যেন আসে
—ক্ষণাভাস—স্পষ্টতায় দীন,
সর্ব্বশুক্ল-অভিধাবিহীন !
আকাশের ফার্নেসে জানি আমি নিঃশেষে
জ্বলে গেছে, গলে গেছে সেই সব দিন ;
—সেই সুরা রঙীন রঙীন !

সেই সব রাত্রি যত ; চুমকিতে চমকানো আকাশের নিচে
স্মৃতি হ'য়ে শব হ'য়ে ছিলো যারা
ছিলো হ'য়ে নিদারুণ মিছে—
কোথাকার মোহ নিয়ে
কোন্ মোহানায় তারা আমাকে টানিছে ?
যত সব উদ্বেলিত রাত্রি আর দিন
অতীত দিগন্ত থেকে হাওয়া নিয়ে আসে
জীবনের ঝরা জুঁই জরার নিশ্বাসে
উড়ে আসে বাতাসে বিলীন ;
সর্ব্বশুক্ল-অভিধাবিহীন !
বিস্মৃতির বিষে তিক্ত কঠোর বৈরাগ্যে রিক্ত
উদ্বেলিত রাত্রি আর দিন !

রৌদ্র-জ্বলা চূর্ণ মেঘে মেঘে
তারকিত নাগবীথী পথে
আজো আছে লেগে

তাদের সে পলাতক পাণ্ডুলোর ছাপ ;
মুমূর্ষু স্মৃতিরা আর্ত্ত ; স্পষ্ট নয় তাদের বিলাপ।
গহন-সায়াহ্ন-বাঁকে
জীবনের স্রোত যায় ঘুরে
বন্য সুরে সুরে
কে বা তারে ফেরাবারে ডাকে ?
অস্পষ্ট গুঞ্জন মন্ত্র
ফেরাবে কি পুনরায় তাকে ?

আকুল জোয়ার আসে মুছে দিতে মলিন হৃদয়
বাতাসে সওয়ার হ'য়ে ছুটে আসে অধীর সময়
ঢেউ তার মনে লাগে নিকো, তবু মন মদির মন্থর
লৌহজিহ্ব ঘড়িটার অনৃতভাষণ এই ঘর-ঘেরা দেয়ালের পর,
সূর্য্য-ঘড়ি আকাশের গায়—
বর্ত্তমান ধ্যাননেত্রে অতীতে ধেয়ায় !
রাত্রি নয়, দিন নয়, এও এক সময়ের নতুন অধ্যায়।

দাঁড়িয়েছি নিরালায় মনচোর-জানালার ধারে,
রৌদ্রের বুদ্বুদগুলি ফোটে ফাটে হাজারে হাজারে
নেমে আসে সে-আকাশ
যে-আকাশ সমুদ্রের মত হ'তে পারে।
যে-পৃথিবী ধানে ঘাসে কাশে অবকাশে
ফিক্‌ফিক্ অনিমিখ হাসে।
সময় এখন লঘু বিশ্রামের বারিধির পারে
সময় এখন লঘু ঘুঘুদের পাখার প্রসারে
চিন্তার চঞ্চল স্রোতে মুহূর্ত্তের মুচকুন্দ ভাসে।

যে-পৃথিবী সারা দিনমান
একদিন শুনেছিলো গান
ধানে, ঘাসে, কাশে, অবকাশে—
আলস্যের শাদা মেঘে আকাশে আকাশে।

আকাশের নীল মুখে (এখন তো) মেঘ-ব্রণ আলোকের ক্ষত
কবেকার ব্যথা নিয়ে আজো দেখি আকাশ আহত।
গলা আজ ক্লান্ত গানে গানে
দানে দানে রিক্ত ক'রে আনে,
হৃদয়ের ডিক্যাণ্টার হ'য়ে যায় ক্ষীণ।
কোথা গেল সে-দিনের সুরা,
সেই স্বপ্ন রঙীন রঙীন !

প্রেম

অরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

মিথ্যার কুহকে ঘেরা জানি প্রেম কৃত্রিম গুণ্ঠন,
তোমার হৃদয়ে আমি স্বর্গ মেনে জানায়েছি দাবী।
মদির বিহ্বল নেত্রে অনিমেষ করেছি লুণ্ঠন
কন্দর্প সৌন্দর্যরাশি, তারে আমি অপার্থিব ভাবি।
তুষার-পরম বক্ষে করুণার ঝরে প্রস্রবণ,
ঈপ্সিত অধর তব, রসনারে তৃপ্ত করি পানে।
তোমার তনুর তীর্থে কামনার করি যে তর্পণ ;
সে-পুণ্যসলিলে আমি ধন্য হই ক্ষণ-স্বর্গ-স্নানে।
অতল ভ্রান্তির ঘোরে যেই প্রেম রচি কল্পনায়,
সে-কল্পলোকের প্রান্তে নিষ্কলঙ্ক দময়ন্তী তুমি
প্রচ্ছন্ন রয়েছো মোর কবিতার প্রত্যন্ত সীমায় ;
পৃথিবীর কন্যা তুমি, মর্ত্যে তবু গড়ি স্বর্গভূমি।
জান এ কৃত্রিম, তবে ভুল যদি চিরদিন হয়,
প্রমাণ প্রচুর থাক, তবু প্রেম অক্ষয় অব্যয়।

একটু সময় হবে

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সময়, তোমার নাগরাপায়ের চলা,
থামাবে একটুখানি ?
দুপুরের রোদে ট্যাংকের ছাদে
ভিজে শাড়িধুতি ঝোলে,
অলস কাকেরা ঠোঁট খোঁটাখুঁটি করে ;
সময় তোমার, একটু সময় হবে
একটু দাঁড়িয়ে দেখার ?

খালাসি পৃথিবী ছুটি নিয়ে গেছে
জাহাজ কর্মশালায়।
গাছের ছায়ায় পায়ের পাতায় পা রেখে তোমার
একটু সময় হবে—
অলস উদাস চোখে চুপ ক'রে এই সব দেখবার ?

বন্দরে বয় দুপুর হাওয়ার লু :
ছাদের স্বপ্নে, ও মেয়ে, তোমার
ভিজে এলোচুল শুকোতে দেবার
সময় একটু হবে ?
কবে ছায়াপথ জাগবে আকাশ-পথে,
জাহাজ-জেটিতে বাজবে ছুটির বাঁশি ;
তবু কি তোমার একটু সময় হবে—
গলা-ফুলো-ফুলো পায়রার ছাদে
খোলা এলোচুলে দুপুরমেয়েকে দেখার ;
বলো না, তোমার একটু সময় হবে ?

কলকাতা

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

মেয়েটি উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে
ভগীরথের সময়ের হৃদয়ের প্রতিলেখন দেখে ;
ওর বিনুনিটি ঋতুর সেতু থেকে আরম্ভ—
আর প্রান্তিক অংশটুকু নগরের পিঠের দক্ষিণ হ্রদে।
বিনুনির বাঁকে বাঁকে কত শত সরকারি অথবা
বেসরকারি দরকারি আত্মীয় রাস্তা জড়ানো।
সকালের আলোর প্রপ্রাতে,
ওর কপালের ওপর রুপোলি এলুমিনিয়মের চুল
ভগীরথের হৃদয়ের আয়নায় ঝিলমিল করে ;
মেয়েটি নামিয়ে চোখ পিঠে বিনুনি ফেলে
কী যেন নিবিষ্ট মনে দেখে।
জনতার সময়ের সমুদ্রের বাঁকাচোরা হাড়ে,
মেয়েটির অশ্রান্ত হাতে বাঁধা পথঘাট ;
আকাশের নিশ্বাসের সকালসন্ধ্যা
লাগে মেয়েটির মাথার উপর।

ঝরা পাতা

শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

ফাগুনের হাওয়া শিমূলের তুলো
ঝরা পাতাদের ঘুড়ি ওড়ায়,
উদাসী মনের নিরালা ক্ষণের
ভাবনার ভেলা কোথা উধাও !

শরতের চাঁদ রূপালি ধূলির ওড়ায় ঝড়
নিচে তুমি বসে কী যে ভাব চেয়ে নির্নিমিখ,
চারিপাশে তব রচে মায়াজাল ছায়া তরল
আমি হ'য়ে উঠি স্বপ্নবিলাসী দার্শনিক !

পশমি মেঘের গুঁড়ো উড়ে সারা আকাশটাতে
চাঁদের মেয়ের এলোচুল দোলে হাওয়ায় মৃদু
হে অপরূপা !
কতদূরে চাঁদ তবু স্ফীত বুক সমুদ্রের
দুর্দম কোন নিগূঢ় প্রেমের আকর্ষণে,
হে বিজয়িনী !
চোখের আড়ালে গেলেও যে মনে উজল তুমি
স্থূল দুবাহুর বাঁধনে কেন বা বাঁধি তোমায়,
হায় রে হায় ।

লাল টিপের কাব্য

শক্তি মুখোপাধ্যায়

দামী গাড়ি থেকে নামলুম
দারোয়ান-বসানো ফটকে ।
বাবুজী, সেলাম ।
বলতে পারো, এ বাড়ীতে সে থাকে কিনা ।
দারোয়ান ঘাড় নাড়লো ।

লাল কাঁকরের আঁকাবাঁকা রাস্তা ।
ফুলগাছগুলোর ভিতর দিয়ে,
পদ্মফুল-ফোটা কৃত্রিম সরোবরের পাশ দিয়ে,
সাদা হাঁসের পদচিহ্ন অতিক্রম ক'রে,
রজনীগন্ধার গন্ধ গ্রহণ ক'রে,
আর দেবদারু গাছের হাওয়ায় সাঁতার দিয়ে
উঠলুম মার্বেল-বাঁধানো রোয়াকে ।
কলিং বেল টিপতে দরোজা খুললো ঝি ।
বলতে পারো, এ বাড়ীতে সে থাকে কিনা ।
ঝি ঘাড় নাড়লো ।

লম্বা ঘরের মধ্যে দিয়ে,
গোল ঘরের উপর দিয়ে,
এ ঘর থেকে ও ঘর, ও ঘর থেকে সে ঘর,
ঝাড়, লণ্ঠন, আসবাব, কারুকার্যকরা মূর্তিগুলোকে

পিছনে ফেলে,
নানা অদৃশ্য আশ্চর্য জিনিসকে উপেক্ষা ক'রে
চ'লে গেলুম সাতমহলা বাড়ীর শেষমহলের সাততলায়।

একটি রুদ্ধ ঘরের সামনে।
পরিচারিকা বেরিয়ে এলো।
বলতে পারো, এ ঘরে সে থাকে কিনা।
পরিচারিকা ঘাড় নাড়লো।

সোনার কবাট।
সংকেত ক'রে আওয়াজ করলুম।
কবাট খুলে গেল।
ভিতরে গেলুম।
চুনি-পান্নার মেঝের উপরে
পড়েছে নতুন সূর্যের আলো।
হীরার খাটে পাতা মখমলের শয্যা,
আর তাতে ব'সে,
অলোকসামান্য রূপের আলোয় ঝলমল
অসামান্য সুন্দরী রাজকন্যা।

কোকিলের মতো কালো তার চুল,
ধনুকের মতো টানা-টানা চোখ,
আর রক্তের মতো লাল তার ঠোঁট,
দুই ভ্রূর মাঝখানে একটি লাল সিঁদুরের টিপ,
যেন দুই নদীর মিলনস্থলে
একটি মূর্তিমান সংগীত,
যার সুরে মেশানো অনন্ত প্রতীক্ষা আর অসীম রহস্য।

বললুম, ওগো লাল-টিপ-পরা মেয়ে,
এক বিন্দু উপলক্ষ্যে যেমন সহস্র-সহস্র কাহিনী,
তেমনি এক বিন্দু টিপে আমার সীমাহীন ভালো-লাগা।
বলো তো, ওগো লাল-পাড়-শাড়ী-পরা মেয়ে,
এ কেমনতরো।

মেয়ে ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষে উঠলো হেসে,
যেন ঝর্নার উচ্ছল স্রোতে পড়লো
ঝুলনপূর্ণিমার চাঁদের আলো।
বললো, গভীর রাতে সবুজ ধানক্ষেতে যখন বেজে ওঠে বাঁশি,
আর উর্বশীর নূপুর-শিঞ্জিনীতে নেচে ওঠে পুরুষের রক্ত,
তখন যেমন, এও তেমনি।

বললুম, যে-থালিতে রয়েছে শ্রেষ্ঠতমের অপরূপ অর্ঘ,
সে-থালিতে যখন লাগবে কালের স্পর্শ,
তখন বাঁচবো কী নিয়ে।
লাল মেয়ে বললো, লাল টিপের মায়া নিয়ে।

অসন্তোষের বোঝা ব'য়ে
সারাদিন পথ চললুম।
মেঠোপথ ধ'রে, কাঁচা ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে।
বাবলা বনে গাইলো মাছরাঙা পাখী,
কচু গাছের তলায় বাসা দেখলুম ব্যাঙের,
সেগুন গাছের নিচে জিরিয়ে নিলুম দুপুরের গরমে।
বিছুটি বনের ভিতর দিয়ে পথ ক'রে নিলুম,
খেজুর গাছ জানালো অভিনন্দন,

কলাগাছ করলো প্রশস্তি,
সূর্য ডুবলো।
রাতের আঁধারের বিভীষিকাতেও হোলো না আমার
চলার শেষ,
বাদুড় ডাকলো, ডাকলো প্যাঁচা,
নাম-না-জানা গাঁয়ের পাশ দিয়ে,
উঁচুনিচু রাস্তার জল-কাদা ঘেঁটে,
কচুরি পানার ফুলকে পদদলিত ক'রে
চললুম আমি বেপরোয়া নির্ভীক।
আকাশে মেঘ ডেকে উঠলো গুরুগুরু,,
বিদ্যুৎ চমকালো, এলো ঝড়।
তবু চললুম।

এ নদীর নাম কী গো ?
কুলনাশিনী।
ওগো মাঝি, পারে যাবে ?
মাঝি বললো, মনের কথার পালে যখন লাগে
অন্তর্কামনার হাওয়া
তখন চলে আমার তরী।
আমি বললুম, যাবো লাল-টিপ-পরা মেয়ের কাছে।
মাঝি বললো, পারের কড়ি লাগবে তোমার অভিজ্ঞতা।
তাই দেব।

নদীর জলে লেগেছে সর্বনাশের অভিশাপ,
তরী কখনো ডোবে-ডোবে, আবার কখনো ওঠে ভেসে।
কত যে ভাসলুম, কত যে ডুবলুম,
তার হিসেব মিললো না।

আকাশে কত পরে উঠলো শুকতারা,
আর কত পরে তরী স্থির হোল।
মাঝি বললো, এই তোমার ঈপ্সিতার দেশ।

দেখলুম, বুড়ো বটগাছে ঝুরি নেমেছে,
পাতায়-পাতায় লেগেছে রাতশেষের হাওয়া।
শিশির-ধোওয়া সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে এসে
থামলুম তালপাতার ছাউনি-দেওয়া একটি কুটিরে।
চালে কুমরোর লতা, মাচায় ঝুলছে শসা,
কঞ্চি দিয়ে তৈরি করা দুয়োর।
ডাকলুম।
সাড়া পেলুম, ভিতরে এসো। ভিতরে গেলুম।

ছেঁড়া কাঁথা, ময়লা বালিশ।
ধূলিপূর্ণ, আবর্জনায় ভরা মেঝের উপর জ্বলছে
একটি প্রদীপ।
স্থির তার শিখা, প্রাখর্য নেই, আছে মৃদু একটি আলো।
দেখলুম পলিমাটির মত শ্যামলরঙা মেয়ে,
হাতে তার রূপোর গিল্টিকরা মোটা ভারি বালা,
গলায় তার রুহিতনের মতো চৌকো চওড়া হার।
কানে তার ভারি গয়না।
দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্যরিক্ততার ছাপ সর্বত্র।
মিশকালো দাঁত, দোক্তা-খাওয়া,
পুরু কালো ঠোঁট, সুডৌল, নিটোল দেহ,
ডাগর চোখে উচ্ছলতা,
আর সুচারু কপালে একটি লাল সিঁদুরের টিপ,

যেন নীল আকাশের কোলে হোলির চাঁদ,
যার আলোয় সরল সৌন্দর্যের আভাষ।
বললুম, ওগো সবুজ-পাড়-শাড়ি-পরা মেয়ে,
এক ঝলক বিদ্যুতে যেমন অন্তহীন বিস্ময়
তেমনি এক ফোঁটা টিপে আমার ভাষাতীত রোমাঞ্চ।
এর নাম কী।

বললো, শিশির-ঝরা ভোরের বাতাসে
যেমন শিউলি ফুলের গন্ধ,
আর বিকেলবেলায় পল্লীরমণীদের যেমন জল আনতে যাওয়া
এও তেমনি।

বললুম, হাওয়ায় যখন তুমি গন্ধ পাবে না,
আর তোমার খোঁপার রক্তজবা যখন উত্তপ্ত হবে না
দেহের রক্তকণিকায়,
তখন থাকবে কী?

বললো, লাল টিপের ঘনীভূত সৌন্দর্যের
একটি অক্ষয় মোহ।

পাপিয়া উঠলো ডেকে,
পূর্বাকাশে অন্ধকারের আঁচল থেকে
ঝরে পড়লো নতুন আলোর রক্তকুসুম।
বললুম, এই কি সত্যি?

প্রদীপ নিভিয়ে
উচ্ছল হাসির ধারায় সিক্ত হয়ে
মেয়ে আঙুল বাড়ালো পুবদিকে।
বললো, অরূপ থেকে রূপ,
আর আলো থেকে আঁধার,
তবু সৌন্দর্যের অনুভূতি চিরন্তন।

তুমি কি রেখেছ কথা

নরেশ গুহ

আকাশ ঘনিয়ে এলো হেমন্তের বিকেলের সুরে
কতবর্ণে কারুকাজ অস্তরাগ রংরেজিনীর,
কাহার খোঁপার গন্ধ খুলে গেলো সায়াহ্ন-তিমিরে ;
নিঃসঙ্গ পাখীর মতো ক্লান্তি নিয়ে এলো ঘুরে-ঘুরে
আর-এক দিনের কথা : চোখ থুয়ে আকাশের নীলে
—তোমার রক্তের মতো পবিত্র হবো—বলেছিলে।
তারপরে কতকাল উড়ে গেছে। জলহারা মেঘ।
—তুমি কি রেখেছ কথা ?
দেখেছ পবিত্র কিনা এ-নিঃসঙ্গ রক্তের আবেগ ?

দুটি স্প্যানিশ কবিতা

(ডস্ প্যাসস্ কর্তৃক Antonio Machadoর কবিতার অনুবাদ থেকে)

হেমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

অনুর্বর পৃথিবীর গা ছুঁয়ে চলা
একটা ওড়নার ক্ষীণ শব্দ,
আর প্রাচীন ঘণ্টার গুরুগম্ভীর কান্না।

দিগন্তের আগুনের
নিবন্ত ইন্ধন।
পিতৃপুরুষের শ্বেত প্রেত
তারাগুলো চলে জ্বেলে'।

বারান্দার জানলা খোলো।
মোহের প্রহর কাছে আসে···
অপরাহ্ণ ঘুমিয়ে পড়েছে
আর প্রাচীন ঘণ্টা দেখছে স্বপ্ন ॥

২

পৃথিবী নগ্ন—
অন্তর ম্লান দিগন্তের দিকে
ক্ষুধিত হায়নার মতো চেঁচায়।
কী তুমি খুঁজছ, কবি,
সূর্যাস্তে ?

কঠিন যাত্রা, কারণ পথ
পরাস্ত করে ;
কনকনে হাওয়া আর
ঘনায়মান রাত্রি আর দূরত্বের
দুস্তরতা···সাদা পথের বুকে
নত গাছের গুঁড়িগুলো কালো দেখায়,
দূর পাহাড়ের সারিতে
সোনালি আর রক্তিম।
সূর্য ঝরছে···
কী তুমি খুঁজছ, কবি,
সূর্যাস্তে ?

আশঙ্কা

কৃষ্ণা দত্ত

পদ্মার ঢেউ ভাঙে···
গর্জন কানে লাগে।
জীর্ণ প্রাণের আবর্জনার দল
ছড়ায় ইতস্তত।
আমরা কী চাই ?
তুলে রেখে দিতে বন্যার মুখ থেকে
সামান্য সঞ্চয় ?
মিটমিটে আলো মাটির দেয়ালে
ছায়া ফেলে যায়
ক্ষীণ বাঁকাচোরা আমাদের দেহে।
গাঁয়ের সন্ধ্যা
ঘুম এনে দেয় ক্লান্ত চোখের পাতায়;
ঘুম এনে দেয় সোনালি ধানের স্বপ্ন।
তারপর রাত কালো হয়ে আসে
আলকাৎরার মত,
ঘুমন্ত প্রাণ কেঁপে ওঠে শুনে
চৌকিদারের হাঁক—
মাঝ-রাতে যেন ঘুম কেড়ে নেয়
সিঁধ-কাটা কোন ভয়।
তাই তন্দ্রায় হাৎড়িয়ে দেখি
সঞ্চয় কই?—আছে তো ধানের গুচ্ছ ?
না কি নিয়ে গেল ধূর্ত সে নিশাচর ?
রাত্রির হাওয়া কানে এনে দিল
পদ্মার গর্জন।

ত্রাসে কেঁপে উঠি—সঞ্চয় গেলো বুঝি···
উঠে যাই···দেখি, আছে, ঠিক আছে
খুব সাবধানে—
প্রহরীর মত আগলে বেড়াই ধানের মড়াই।

মনে হয়
পদ্মার জলে ঈশানী হাওয়ায়
কে যেন এ-তীরে আসে
আমাদের ভালোবেসে
ময়ূরপঙ্খী নৌকো বুঝি বা
এই তীরে ঠেকে যাবে—
সুদূর দেশের কোন পসারিণী
গভীর রাত্রে পসরা বিলোবে
মনে হয়,
মনে হয় যেন স্বপ্নে।
আমাদের চোখে লেগে গেল বুঝি
সব-ফিরে-পাওয়া স্বপ্ন।

একচক্ষু

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যতোদূর দৃষ্টি যায়
কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে রোমাঞ্চিত মনের উদ্যম
সদ্যোজাত নীপবনে সতৃষ্ণ তাকায়।
পৃথিবীতে প্রকৃতিতে আয়োজন কম
হয়নি তো কোনোদিন, চৈত্রদিনে বসন্তবাতাস
প্রবাহিত হয়েছেই, ঘনঘোর শ্রাবণের রাতে
মেঘে-মেঘে ঝরেছে আকাশ;
স্বর্ণবর্ণ তপনের কিরণসম্পাতে
মসৃণ সবুজ মাঠে হেসেছে হেমন্তের সোনালি শিশির;
গ্রীষ্মের প্রখর দিনে তীব্র আম্রমুকুলের ঘ্রাণে
ডালে-ডালে অজানিত পাখীদের ভিড়।

পৃথিবীতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে
সৌন্দর্য্যের আবেদন ঋতুতে ঋতুতে প্রতি মানুষের কাছে;
আকাশে যে সূর্য্য ওঠে তার পিছে ঘন নীলিমায়
দিগন্তের মেঘে-রঙে অপূর্ব্ব বিস্ময় দেখা যায়,—
পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে ঘোর রাতে ঘুম ভেঙে দিয়ে
খেলা করে রূপসীর মুখের মতন,
সচেতন নিরুত্তাপ হৃদয়কে নিয়ে;
কখনো ফুলের ঘ্রাণ আমাদের প্রাণ ছোঁয় চুম্বনের মতো;
পৃথিবীতে আয়োজন অব্যাহত থাকে অবিরত।

আমরাই একচক্ষু শুধু, ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে ;
জলে স্থলে শূন্যে নীলে চিরন্তন ছায়া-শরীরিণী
নব-নব রূপে হানা দেয় দগ্ধ হৃদয়ের বিবেকের কাছে,
অনেক নিভৃত রাত্রে শোনা যায় বিচিত্র কিঙ্কিণী।
মাঠে-মাঠে ছায়া পড়ে, ছায়া সরে' যায়,
হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ আন্দোলিত গাছের পাতায় ;
মনে পড়ে' যায়
দূরের উজ্জ্বল মুখ সুবসনা সুনয়না অরূপ মধুর,
স্তম্ভিত মুহূর্ত্তে মন স্মৃতিভারে যেন তন্দ্রাতুর ;
বহু ক্রোশ পথ হ'তে এসে
হৃদয়ের গভীর প্রদেশে
ধীরে-ধীরে মেশে
একটি গভীর ক্ষীণ সুর।

নিভৃত হৃদয় নিয়ে যদি কোনো একদিন শুভ অবসরে
আচ্ছন্ন হৃদয়বাষ্প ফুল হ'য়ে ঝরে,
স্নানরতা রমণীর পদ্মওষ্ঠে স্তনযুগে কটিতটে চোখ গিয়ে পড়ে,
দোলা লাগে হাড়ভাঙা বক্ষের পিঞ্জরে,
মনে রেখো নীলাকাশ বাঁকা চাঁদ নীল ফুল মাঠের শিশির,
পাতার আড়ালে পাখীদের
ছায়াঘেরা ছোট-ছোট নীড়।
প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে,

কুমারীর মতো তার অনেক প্রত্যাশা
আগন্তুক মানুষের কাছে ;
প্রখর বিবেক-বাণ প্রাণে অবিরত,
আমরাই একচক্ষু, আমরাই ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো,
বাঁচবো কী নিয়ে ?
তবুও হঠাৎ যদি সংসারের আবর্জনা ঠেলে
নীড়মুখী পাখীর মতন
দুরন্ত আবেগ বুকে জেলে
একঘেয়ে প্রয়াসের হয় ব্যতিক্রম,
যদি দূরে দৃষ্টি যায়
কল্পনার সিঁড় বেয়ে রোমাঞ্চিত মনের উদ্যম
সদ্যোজাত নীপবনে ফুলে ফলে সতৃষ্ণ তাকায়
মনে রেখো পৃথিবীর রোমাঞ্চিত প্রকৃতির মৌন প্রতীক্ষার
কোনো অন্ত কোনো সীমা কোনো শেষ নেই,—
আচ্ছাদন খুলে ফেলে রমণী নেমেছে যেই জলে
কামনার পদ্মগুলি ফোটে পলে-পলে,
মনে রেখো নীতিবাক্য : অপমৃত্যু ডেকে আনে একচক্ষু
যতো হরিণেই ॥

দিল্লিকা ছর্‌রা

পরিমল রায়

তোমরা বল দিল্লিকা লাড্ডু,
আমরা বলি, দিল্লিকা লাট্টু।
ঘুরছে লুটের লাট্টু রে ভাই,
লম্বা যে তার লেত্তি,
দেখতে আসে ভিড় করে' তাই,
হরেক রকম ব্যক্তি।
হাতে ঘোরায়, হাত বদ্‌লায়,
হাতাহাতি কাণ্ড,
শেষকালে এক অট্টালিকা
হাঁকড়ায় প্রকাণ্ড,
গুগ্‌লি গেলে ব্যাঙে, এবং
ব্যাঙকে গেলে সর্প,
কোত্থেকে এক বেজি এসে
ঘোচায় সাপের দর্প।

মারবে এখন বেজি কে?
এমন, বল, তেজী কে?

আকাশে ও অঙ্গনে নিদারুণ কন্‌কনে
এখনি যা ঠাণ্ডাটা বইলো,
কী হবে-যে পৌষে জানিনে আদৌ সে,
ভেবে মন শিহরিত হৈল।

ওরে তোরা রুষকে দে না, ভাই, উস্‌কে,
সোভিয়েট এসে যাক্ তালুকে।
কাঁথা যার সম্বল, চাই তার কম্বল,
সারা দেশ ছেয়ে যাক্ ভালুকে।

লোকে মরে বাংলায়,
কে বা কাকে সামলায়,
দিল্লির দায় নয় এক তো,
ফকির অব্ ইপি-কে
করে টেপাটেপি কে,
অতএব কোরো নাকো ত্যক্ত।
সবই হবে আস্তে,
শেখো বাপু হাস্‌তে,
হেসে-হেসে প্রাণ দাও বাঙালি,
শরীরে কি প্রাণ নাই?
আছে শুধু কান্নাই?
এ কী প্রাণধারণের কাঙালি!

সবুরে…

বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাড়ি, গাড়ি, টেলিফোন,
মসৃণ জীবন ;
মোটা স্বামী, মোটা মাইনে, মোটাসোটা
দুটি কি তিনটি ছেলেমেয়ে।
এই সব পেতে-পেতে, নিতে-নিতে
কেটে গেল পঁচিশ বছর ;
ভেবেছি, আগে তো বাঁধি ঘর,
কাব্যচর্চা পরে হবে।
তারপর
এই তো আর-বছর
পাহাড়ে ছুটির বাড়ি, রঙিন বাগান
সবে হ'লো সারা,
কাব্যজীবন সুরু করতেই দেখি,
মন গেছে মারা।

মাতলামো

তাও ইউয়ান-মিং
(৩৬৫-৪২৭ খৃঃ)

"হাতে কোনো কাজ নেই, বাড়িতে বসে আছি, মনে নেই সুখ। এখনকার এই রাত্রিগুলোও দীর্ঘ হয়ে গেছে। হঠাৎ কাছে পাই দামী মদ, এমন রাত যায় না যেদিন মদ না খাই। কিন্তু বড় একলা, নিজের ছায়ার দিকে চেয়েই রাত কাটে। একটুতেই মাতাল হয়ে পড়ি, কিন্তু তারপরও নিজের খুসীমতো লিখি গোটাকয়েক ছত্র। ক্রমেই কবিতার স্তূপ জমে যায়। আজে-বাজে নানা লেখা। খেয়ালের ঝোঁকে এক পুরোনো বন্ধুকে দিয়ে সেগুলো ভালো করে নকল করিয়ে নিয়েছি।"

(১)

জীবনের উঠতি নামতির কিছুই চিরস্থির নয়
সবই বদলায় ঘুরে ঘুরে।
সাও ফিংকেও ফলের চাষ করতে হয়েছিলো,
তুং লিং এর দেশও আজ নেই।
শীত, গ্রীষ্ম, দুজনকেই জায়গা ছেড়ে যেতে হয়,
মানুষের ধর্মও তো তাই।
যারা সব জানে তারা এটা বোঝে
যা গেছে তা নিয়ে তারা সন্দেহ করে না।
হঠাৎ মদের পেয়ালা পেলে
দিনরাত তা আঁকড়ে ধরে থাকি।

(২)

কথা আছে, জন্ম-জন্মান্তরের জমানো পুণ্যের
সুফল তুমি পাবে,
তবু তো প-ই আর স্থ-ছি

* গদ্য ভূমিকাটি কবির নিজের।

এরা থাকতো পশ্চিমের পাহাড়ে,
শেষে না খেতে পেয়ে মারা গেল।
পাপ-পুণ্যের ফল-লাভ তো ঠিক মানুষের হয় না
তবে কেন এই ফাঁপা কথাগুলো চেঁচিয়ে মরে ?
সেই যে নব্বুই বছরের বুড়ো বিনা বঁড়শিতে মাছ ধরতো
আগে তো তাকেও শীত আর ক্ষিদে নাকাল করেছে।
নিজের নিজত্বটিকে ভদ্রভাবে মেনে চলা কিছু নয়
শত শতাব্দী পরে কে ভাববে তোমার কথা ?

(৩)

আজ থেকে হাজার বছর আগে সত্যের মরণ হয়েছে,
সেইজন্যেই তো সবাই আজ দুঃখু করে।
এ যেন মদ রয়েছে অথচ মদ খাই না।
তোমরা কেবল জগতে নামের প্রত্যাশী
কিন্তু দামী জিনিষের সার হচ্ছে নিজের শরীর।
এই নাম কেনা কেবল নিজের জীবনেই
সারা বিশ্বপ্রাণে তার অংশই নেই কোনো।
ক'টাই বা বছর বাঁচবে ?
বিদ্যুতের ঝলকানির মত দ্রুত।
বড় জোর একশ বছর,
কিন্তু এই শরীর নিয়ে তোমার হবেই বা কী ?

(৪)

বস্তির ভিতর আমার ছোট্ট কুঁড়ে
তবু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ এখানে নেই।
"এ-রকম ভাবে আপনি থাকেন কী করে ?"
"আমার মন তো এখানে থাকে না,
সে থাকে এখান থেকে অনেক দূরে নির্জনতার মধ্যে।"

গিয়েছিলুম পুবের বাঁথারি ঘেরা বাগানে
চন্দ্রমল্লিকা তুলতে :
আস্তে চোখের পাতা তুলেই দেখি দক্ষিণের পাহাড়।
পাহাড়ের হাওয়া সবচেয়ে ভালো
ভোরবেলায় আর গোধূলিতে।
আকাশের এই পাখিরা আমার সঙ্গে
মিতালি পাতিয়েছে।
এর প্রত্যেকটাই সত্য
আমি বোঝাতে চাই কিন্তু কথা ভুলে যাই।

(৫)

হেমন্তে চন্দ্রমল্লিকার অপরূপ রূপ,
ভোরবেলা শিশির-ভেজা ফুল তুলবো।
আমি এই ফুলে ডুবে
এর 'দুঃখ-ভোলা' নাম সার্থক করি।
এই ফুল আমাকে উপহার দেয় বৈরাগ্যের নেশা।
একলা, তবু এক পেয়ালা চলে,
কেউ তো নেই তাই পেয়ালা শেষে নিজেই আবার ঢেলে নি।
সূর্য্য ডোবে, সব-কিছুর মধ্যে ব্যস্ততা
মিলিয়ে যায়, নিবে যায়।
ঘর-ফেরা পাখির দল চলেছে
বনের দিকে ডাকতে-ডাকতে।
পুবের ঘরে ব'সে খুশীমত শিষ দিয়ে চলি।
জীবনের ক'টা দিন মজায় কাটাই।

(৬)

ভোরে দরজায় ধাক্কার শব্দ,
তাড়াতাড়ি উল্টো জামা গায়ে চড়িয়ে দরজা খুলি,

শুধোই, "কে তুমি ?"
দেখি বুড়ো চাষী এসেছে তার প্রীতি নিয়ে।
দূর থেকে ব'য়ে এনেছে মদের ভাঁড়।
শুধোয়, "কেমন আছেন ?"
আমার মনে হয় এই দিনকালের সঙ্গে আমি বেখাপ্পা।
বলে, "মানিয়ে বাঁচতে গেলে এইরকম ছেঁড়াখোঁড়া
খোড়ো চাল তো যথেষ্ট নয়।
এ-জগতে সবার ওই সমান ধরন
ওদের সঙ্গে মিশে ওদের মদে পিষে ফেলো।"
ও গুরুজন, ওর কথায় মন গলে যায়।
মায়ের পেটেই পেয়েছি এই বেসামাল ছন্দ,
"আলগা লাগামে" চলা শিখতে পারি
কিন্তু মন বলছে সেটা ভুল হবে।
তার চেয়ে এসো একটু মদ টানা যাক্,
আমার ঘোড়ার মুখ ফেরার নয়।

(৭)

বহুদিন আগে বেরিয়ে চ'লে গিয়েছিলুম অনেক দূরে,
সোজা পূব-সাগরের কোণে।
দূরের পাড়িতে আঁকাবাঁকা রাস্তা,
মাঝে আছে ঝড়, তুফান, বিপদ, বাধা।
এই পাড়ির জন্য দায়ী কে
এখন বোধ হচ্ছে ক্ষুধার তাড়া।
এক পেট ভরাবার ব্যবস্থায় সব ছেড়েছিলুম,
একটু পেতেই যথেষ্ট হয়েছে।
পাছে সামান্য এই কাজের জন্যে নাম খোয়াই,
তাই রথের মুখ ফেরাই আরামে।

(৮)

পুরোনো বন্ধুরা আমার খেয়ালের তারিফ করে,
মদের পাত্র আসে, একে-একে আসে অন্য অনেকে।
ঘাস সরিয়ে ঝাউ-ডালের নিচে বসা যায়
কয়েক পেয়ালাতেই সুরু হয় মাতলামো।
গুরুজনদের কথাও হ'য়ে পড়ে খাপছাড়া।
যেমন-তেমন মদ ঢেলে চলি।
নিজের সত্তা আছে কি নেই বুঝি না,
উপকরণের দাম কী ক'রে বোঝো ?
কে যে রয়েছে ঝোঁকের মাথায় তাও ভুলেছি,
মদে রয়েছে গভীর সোয়াদ।

(৯)

ছেলেবেলায় কাজের চাপ ছিল কম
তখন ভাব জমিয়েছি সব ধরনের বইয়ের সঙ্গে।
ক্রমশ চল্লিশে পৌঁছে দেখি
একেবারে ডুবেছি, সবই বৃথা।
শেষে ভদ্রতার খাতিরে
ক্ষিধের আর ঠাণ্ডার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হয়েছে।
জীর্ণ কুটির মিতা পাতিয়েছে দুঃখের হাওয়ার সঙ্গে—
বুনো ঘাসে আঙিনা একেবারে ঢাকা,
চাঁদর মুড়ি দিয়ে লম্বা রাত কাটাই,
ভোরে মোরগ আর ডাকে না
বন্ধু মংকুং এখানে নেই…
শেষ পর্যন্ত আমার আবেগকে ঢাকা দিয়ে রাখি।

(১০)

ই আর থুং আমার অনেক আগে,
তারপর পৃথিবীতে সত্যের লোপ
লু দেশের বুড়ো সারাক্ষণ ব্যস্ত,
জোড়াতাড়া দিয়ে দেশকে ভালো করে তুলবে,
তবু ফং পাখি এলো না।
সঙ্গীতে আর ব্যবহারে কিছুদিনের জন্য এলো নতুনত্ব,
এই ক্ষাণ শব্দও শেষে থেমে গেল।
মত্ত স্রোত এলো পাগল ছাঁৎ এর কাছে
বইয়ের আর কী পাপ ?
একদিনে তারা ছাই আর ধুলো বনে গেল।
তারপর এল বুড়ো পণ্ডিতের দল,
চললো আসল ধৈর্য্যের কাজ
কিন্তু পরের দলে কোনো বইয়েরই দাম নেই,
সারাদিন কেবল গাড়ি চড়া আর হাঁটা
কোথায় এরা যাবে, কোনোই উদ্দেশ্য নেই।
তাহ'লে মজা ক'রে মদ চালাও,
খোলা পাগড়ির অপমান কোরো না।
নিজের ভুলের জন্যে আমি নিজেই দুঃখিত,
মাতালকে আপনারা ক্ষমা করবেন ॥

অনুবাদ—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কালো চুল

বুদ্ধদেব বসু

আজো তো মনে হয় মেঘ যেন মেঘ নয়, কার চুল,
কার চুল, কালো চুল, এলো চুল,
কঙ্কাবতীর কালো এলো চুল !
কঙ্কাবতী তার কালো চুল খুলে দিলো সন্ধ্যার সোনালি বারান্দায়,
স্বর্গের মায়াবী বারান্দায়,
লাল সূর্যাস্তের জানলায় ;
লাগলো আলো চুলে, জাগলো উচ্ছ্বাস স্বচ্ছ সবুজের,
বিলোল হলুদের আগুনে বেগনির বিশ্রাম,
উষ্ণ বাদামির হৃদয়ে ধূসরের শান্তি,
রঙের অঙ্গনে আঁধার সন্ধ্যার শান্তি।

আর্দ্র-উজ্জ্বল ধারালো-ছলোছলো ভাদ্রের হলদে বারান্দায়
কঙ্কাবতী এসে দাঁড়ালো,
খুলে দিলো কালো চুল, আহা কী কালো চুল ! লাল সূর্যাস্তের সন্ধ্যায়।
খুলে গেলো পশ্চিমে সূর্যের জাদুকর জানালা
রঙের রূপসীরা বাড়ালো মুখ ঐ শৌখিন প্রাসাদের জানলায়,
দাঁড়ালো দলে-দলে রৌদ্রের প্রাসাদের ধারালো-জ্বলোজ্বলো জানলায়,
পশ্চিমে অন্তিম সূর্যের জানলায়-জানলায়।
তবু তো পার হ'য়ে উত্তাল-লাল আর উদ্দাম হলুদের বন্যা
কখন তুমি এলে, কঙ্কা !
সিন্দুর-আলতার হলদে-লালে জ্ব'লে আহ্লাদে গ'লে যাক সন্ধ্যা,
রাত্রি তুমি নিলে, কঙ্কা।
তোমার কালো চুল ছড়ায়ে দিলে দূর নীল দিগন্তের প্রান্তে,

মত্ত বিপ্লবী অপলাপ পার হ'য়ে দাঁড়ালে শাশ্বতী শান্তি ;
আর্দ্র-উজ্জ্বল তীব্র-থরোথরো ভাদ্রের সৌম্য সীমান্তে
আশ্বিন এনে দিলে, কঙ্কা !

সৌর-শৌখিন দীপ্ত জানালায় নিবলো একে-একে
রেশমি রূপসীরা ; সোনালি অপ্সরী সাজলো সবুজে ;
হলদে আগুনের রঙ্গ থেমে গেলো বেগনি-বাদামির
অলীক অঙ্গনে ; রঙের রঙ্গমঞ্চের পঞ্চ অঙ্ক
হঠাৎ হ'লো শেষ ; সন্ধ্যাতারা-ফোটা শান্ত আশ্বিনে
তীব্র ভাদ্রের সন্ধ্যা নিবলো ; বাজলো ঘণ্টা
শিউলি-শিশিরের ; নামলো নিঃসীম নীলিম রাত্রি
ধূসর সুন্দর দূর দিগন্তে ; আলোর উল্লোল
আকাশ ডুবে গেলো কালোর বন্যায়
তোমার নীল-কালো চুলের বন্যায়, কঙ্কা, কঙ্কা !
বাজলো ঘণ্টা কঙ্কা কঙ্কা অন্ধকারে আর
সন্ধ্যাতারকার স্তব্ধ সবুজে। সব তো হ'লো শেষ,
এখন শুধু তুমি, শব্দ শুধু শুনি কঙ্কা, কঙ্কা,
কঙ্কা, কঙ্কা !
তারার কম্পনে লক্ষ-কোটি যুগ বাজায় কঙ্কণ
কঙ্কা, কঙ্কা !
আঁধার আকাশের হাজার বিশ্বের বহ্নি হ'লো লীন
তোমার কালো চুলে,
তারার অগ্নিতে ছড়ালো মগ্নতা তোমার কালো চুল,
তোমার কালো চুল যুগ-যুগান্তের দূর সীমান্তে
ছড়ালো শান্তি, অতল অন্তিম শান্তি, শান্তি,
শান্তি, কঙ্কা,
কঙ্কা, শান্তি।

কঙ্কা, তুমি যেই দাঁড়ালে বিশ্বের ছায়াপথে ছড়ানো বারান্দায়,
দাঁড়ালে চুপ ক'রে কুটিল জঙ্গম কালের ক্রান্তির প্রান্তে,
একটু মুখ তুলে খুলে দিলে কালো চুল লক্ষকোটি তারা ছড়ায়ে,
অমনি শান্তি, শান্তি নামলো,
থামলো ক্রান্তির মত্ত উচ্ছ্বাস,
ডুবলো কালো চুলে বস্তু-বিশ্বের ব্যস্ত উচ্ছ্বাস,
ডুবলো বিপ্লব নিশীথ-নিঃসীম নীল সমুদ্রে,
কঙ্কা, কঙ্কা !
আঁধার-বন্যায় হাজার বিশ্বের তারার বুদ্বুদ
ফুটলো, ডুবলো,
বিশ্ব-বস্তুর বুকের বিদ্যুৎ মিশলো কালো চুলে,
শান্তি, শান্তি।
মত্ত অস্থির রঙিন দৃশ্যের নৃত্য ফেলে দিলো
লজ্জা, সজ্জা,
মগ্ন হ'লো তার নগ্ন সত্তা স্তব্ধ রাত্রির
লগ্নে, কঙ্কা ;
কঙ্কা, তুমি এই স্তব্ধ গম্ভীর আদিম অন্তিম
রাত্রি, শান্তি,
সব তো হ'লো শেষ, এখন শুধু তুমি, তোমার কালো চুলে
শান্তি, শান্তি।

অভিষেক

বুদ্ধদেব বসু

আমি তো বুঝিনি কবে যুবরাজ-গ্রীষ্মের স্বরাজ
কেড়ে নিলো বিপ্লববিলাসী বর্ষা ; কখন আকাশে
শ্রাবণের বাণিজ্যের দিগ্বিজয়ী মৌসুমি জাহাজ
চূর্ণ হ'য়ে ছড়ালো গোপন পণ্য নীলের বিন্যাসে,
অধমর্ণ অক্ষম মেঘের বর্ণে, হলুদে, সবুজে,
লালে, সোনালির আশ্চর্য অলীকে ; তারপর দূর
দিগন্তের ধূসর কম্পনে লীন, সন্ধ্যার গম্বুজে
রেখে গেলো সন্ধ্যাতারা, অন্ধকারে নিঃসঙ্গ বিধুর।

বিধুর ? . . . তাহ'লে কেন শান্তি ঝরে শেফালি-শিশিরে,
রাত্রি কেন ধ্রুপদী তারায় মগ্ন, তৃপ্ত কেন দিন ?
ঐ ! ঐ ! বৈশাখের যুবরাজ রাজা হ'য়ে ফিরে
এলো আজ, এলো শুভ্র, শুদ্ধশীল, মনস্বী আশ্বিন !
অগ্রিম অম্লান যেন অন্তিম শ্রাবণে দিলো ঘিরে
ক্ষমার ক্ষমতা দিয়ে, শ্রীলতার শৃঙ্খলে স্বাধীন।

শীত

বুদ্ধদেব বসু

হে শীত সুন্দর শান্ত, হে উজ্জ্বল নম্র নীল দিন,
উদয়াস্ত সূর্য দিলো উজ্জীবনী শোণিত-শর্করা
বিন্দু-বিন্দু তোমার শিরায় ঢেলে, হ'লে রৌদ্রলীন
তনুর তন্তুর জালে, আকাশের মেঘচিহ্নহীন
মেদশূন্য সৌম্য সুষমায়, উত্তরের তীক্ষ্ণ, কড়া
হাওয়ার স্নায়ুর টানে ;—তবু কেন, তবু কেন জরা
তোমার কুঞ্চিত মুখে আঁকে সূক্ষ্ম মৃত্যুর মহড়া—
কী শীর্ণ কৃপণ আলো, ক্লান্ত, ম্লান, কৃশ তবু দিন !

আমিও, আমিও তা-ই। আমারেও সূর্যের শোণিত
দিলো তার অমরত্ব-স্বত্ব-সার জায়ার জঠরে,
শিশুর সর্বস্ব-স্পর্শে, যুগ্ম-যুক্ত ঘুমের কোটরে,
অফুরন্ত, অন্তহীন ! . . . লজ্জা-ভাঙা আশ্চর্য সম্বিৎ
যেন তীব্র তপ্ত বেগ হৃৎপিণ্ডে কম্পিত মোটরে ! . . .
তবু তাপ, তাপ নেই ! . . . তবু শীত, তবু আসে শীত !

মাইকেল

মাইকেলের খ্যাতির সঙ্গে মাইকেলের কীর্তির সুমাত্রা-সূত্রের সম্বন্ধ নয়। যদিও পণ্ডিতেরা পক্ষপাতী ছিলেন না এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর ঠোঁট বেঁকিয়েছিলেন, তবু সমসাময়িক পাঠকসমাজে মাইকেলের আধিপত্য সূচিত হয়েছিলো মেঘনাদবধকাব্য প্রকাশিত হবার আগেই। আর তার পর থেকে আজ প্রায় একশো বছর ধ'রে আমরা অবিশ্রান্ত শুনে আসছি যে মাইকেল মহাকবি, বাংলা সাহিত্যের ত্রাতা এবং বাংলা কাব্যের মুক্তিদাতা। তাঁর ঘটনাবহুল নাটকীয় জীবন, জীবনের শোকাবহ সমাপ্তি তাঁর প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেছে; এবং সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে পুনরুজ্জীবিত মাইকেলের যে-ছবি ফুটেছে তার দিকে ভালো ক'রে তাকালে এ-কথা মনে না-ক'রে পারা যায় না যে বাঙালি আসলে তাঁর কবিকর্ম সম্বন্ধে ততটা উৎসাহী নয়, যতটা তাঁর জীবনীর অসামান্য চিত্রলতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসী।

সত্যি বলতে, মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম কুসংস্কার। কর্মফল তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে সেই ভুল স্বর্গে যেখানে মহত্ত্ব নিতান্তই ধ'রে নেয়া হয়, পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। এ-অবস্থা কবির পক্ষে সুখের নয়, পাঠকের পক্ষে মারাত্মক। আধুনিক বাঙালি পাঠক মাইকেলের রচনাবলী প'ড়ে এ-মীমাংসায় আসতে বাধ্য যে তাঁর নাট্যরাজি অপাঠ্য এবং যে-কোনো শ্রেণীর রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অযোগ্য, মেঘনাদবধকাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশপদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র, এমনকি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বীরাঙ্গনাকাব্যেও জীবনের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে। মাইকেলের ইংরেজি পত্রাবলীতে প্রাণশক্তির যে-প্রাচুর্য দেখি, এটা আশ্চর্যই যে তার সংক্রমণ দুটি প্রহসন ছাড়া আর-কোনো রচনাতেই নেই—এবং প্রহসন দুটিও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নাটক

নয়, নবিশের কাঁচা হাতের কৃশাঙ্গ নকশা মাত্র, অনেকটাই তার ছেলেমানুষি। কিন্তু এ-সব কথা মুখ ফুটে কেউ কি কখনো বলেছে? একেবারেই বলেনি, এত বড়ো অপবাদ বাঙালির ধীশক্তিকে দেবো না, রবীন্দ্রনাথের একুশ বছর বয়সে লেখা মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা স্মরণীয়। ঐ প্রবন্ধের চিন্তাবিন্যাসে অপরিণত মনের পরিচয় স্বভাবতই আছে, কিন্তু নিছক সত্যই যে বলা হয়েছিলো তাতেও সন্দেহ নেই। অথচ রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রচলিত কুসংস্কারের প্রভাবে সে-প্রবন্ধ পরবর্তী জীবনে প্রত্যাহরণ ক'রে অন্য-কোনো সুযোগে মাইকেলের স্তুতি করেছিলেন, তাও প্রচলিত কুসংস্কার অনুসারেই। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের সমালোচনার বক্তব্য ছিলো এই যে মেঘনাদবধকাব্য কবিত্বের কেরানিগিরি মাত্র, মাইকেল স্রেফ নকলনবিশি ছাড়া আর কিছুই করেননি, এপিকের বিভিন্ন লক্ষণ প্রাচীন সাহিত্য থেকে জেনে নিয়ে অন্ধ অধ্যবসায়ে তার প্রত্যেকটি প্রয়োগ করেছেন: ভাবখানা এইরকম যেন 'এসো একটা এপিক লেখা যাক' ব'লে সরস্বতীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে এপিক লিখতে ব'সে গেলেন।

বলা বাহুল্য, এ-সমালোচনা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। উত্তর-রবীন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে, মেঘনাদবধকাব্য হ'য়ে-ওঠা পদার্থ নয়, একটা বানিয়ে-তোলা জিনিশ। আয়োজনের, আড়ম্বরের অভাব নেই, সাজসজ্জার ঘটাও খুব, কিন্তু সমস্ত জিনিশটা আগাগোড়াই মৃত, কোথাও আমাদের প্রাণে নাড়া দেয় না, হৃদয়ে আন্দোলন তোলে না। পুরোপুরি নয় না হোক, অন্তত পাঁচটা-ছ'টা রস মেপে-মেপে পরিবেশন করেছেন কবি, কিন্তু তাঁর বীর রসে উল্লাস নেই, আদি রসে হৃৎস্পন্দন নেই; তাঁর করুণ রসে চোখ শুকনো থাকে এবং বীভৎস রস শুধুই বীভৎসতা। মহাকাব্যের কানুন সবই মেনেছেন তিনি, বড্ড বেশি মেনেছেন; কখনো মিল্টন, কখনো বা হোমরকে স্মরণ ক'রে নিয়ম-রক্ষার জন্য তাঁর অশ্রান্ত ব্যস্ততা: ফলে সমগ্র কাব্যটি হয়েছে যেন ছাঁচে-ঢালা কলে-তৈরি নির্দোষ নিষ্প্রাণ সামগ্রী; দোকানের জানলার

শোভা, ড্রয়িংরুমের অলংকরণ, কিন্তু অন্তঃপুরে অনধিকারী ; কিঞ্চিদধিক ছয় সহস্র পংক্তির মধ্যে দুটি চারটির বেশি নেই যা প'ড়ে মনে হয় কবি শুধু নিয়মমাফিক চলতে চাননি, কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

তারুণ্যের সত্যভাষণ ভারতীতে প্রকাশিত হবার পঁচিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজ-নিন্দার প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করলেন 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে। ভারতীয় চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার শুভপ্রসূ মিলনের উদাহরণরূপে তিনি যে মেঘনাদবধকাব্যকেই নির্বাচন করেছিলেন তার প্রকৃত কারণ কি এই নয় যে মানসী কি সোনার তরী কি কাহিনীর উল্লেখ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো? 'মেঘনাদবধকাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রামরাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে-ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। ...যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে-মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।' এ-কথা মনে করা কি সম্ভব যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানতেন না তাঁর এই মন্তব্যে যাথার্থ্য নেই, আছে শুধু চলতি মতের পুনরুক্তি? মাইকেল সম্বন্ধে যে-ক'টি প্রবাদ বাঙালির মনে বদ্ধমূল, তার মধ্যে এইটেই প্রধান যে ঝিমিয়ে-পড়া ধমনীতে পাশ্চাত্ত্য রক্ত সঞ্চার ক'রে বাংলা সাহিত্যকে চেতিয়ে তোলেন তিনিই প্রথম। সত্যই যদি তা-ই হ'তো,

তাহ'লে মাইকেলের অনতিপরে এবং তাঁরই প্রভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎস খুলে যেতো, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষায় ব'সে থাকতো না। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাইকেলের প্রভাব যে বলতে গেলে শূন্য, এমনকি মোহিতলালের প্রশংসনীয় উদ্যম সত্ত্বেও তাঁর প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর পর্যন্ত জাদুঘরের মূল্যবান নমুনা হ'য়েই রইলো, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-সাধনায় তাঁর ব্যর্থতার এইটেই প্রমাণ। বললে হয়তো কালাপাহাড়ি শোনায়, কিন্তু কথাটা একান্তই সত্য যে বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ভাব মাইকেল আনতে পারেননি, এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; মাইকেলে শুধু আকাঁড়া অনুকরণ (যার সবচেয়ে লোমহর্ষক দৃষ্টান্ত অষ্টম সর্গের নরকবর্ণনা), রবীন্দ্রনাথে সসত্ত্ব অনুপ্রাণনা। শুধু জনরব দ্বারা চালিত না-হ'য়ে মন দিয়ে মেঘনাদবধকাব্য পড়লে আজকের দিনের যে-কোনো পাঠক বুঝবেন যে প্রকরণের অভিনবত্ব বাদ দিলে তাতে 'অপূর্ব পরিবর্তন' বা 'বিদ্রোহ' কিছুমাত্র নেই, বরং সে-গ্রন্থ দৃষ্টিহীন গতানুগতির একটি অনবদ্য উদাহরণ। শুধু প্রহসন দুটিতে ছাড়া অন্য সর্বত্রই এই অনন্য গতানুগত্য মাইকেলের শক্তিকে পাংশু ক'রে দিয়েছে: নামে, পানাহারে, নিত্যকর্মে ও নিত্যকার ভাষায় প্রতিশ্রুত বিজাতীয় হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা সেইজন্যই, তাঁর রচনায় যে-মন প্রকাশ পেয়েছে তা তৎকালীন লোকধর্মের সংকীর্ণ সংস্কারে আবদ্ধ। যদি তিনি ব্যাস-বাল্মীকির নৈষ্ঠিক অনুসরণ করতেন, তাহ'লেও সংস্কার-পাষাণের শাপমুক্তি হ'তো; কিন্তু মূল পুরাণের কঠোর বাস্তবিকতা কাশীরাম-কৃত্তিবাসের কৃপায় সেই যে লোকাচার-প্রচারে অধঃপতিত হ'লো, বাঙালির পক্ষে তার প্রভাব এড়ানো আজ পর্যন্ত দুঃসাধ্য, এবং তার নির্জীবক সংক্রাম থেকে মাইকেলের দুর্দান্ত বিলেতিপনা তাঁকে বাঁচাতে পারেনি। হয়তো আদিকবির বিশ্বব্যাপী অনুকম্পা বর্তমান জগতে সম্ভবই নয়, আর তা-ই যদি হয়, তাহ'লে তো পুরাণের পুনর্জন্মই আধুনিক কবিকৃত্য, দেশে-দেশে, যুগে-যুগে তা-ই ঘটেছে, ইংরেজি সাহিত্যে চসর থেকে ইএটস পর্যন্ত, আমাদের

দেশে রবীন্দ্রনাথ থেকে···কোন পর্যন্ত তা আরো দু'চারশো বছর পরে কোনো সমালোচক বলতে পারবেন। এখানে অনুধাবনযোগ্য এইটুকু যে আমাদের সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্ম মাইকেল ঘটাননি, ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ : পুরাণ বা ইতিহাসের কাহিনীকে বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারলে তবেই তা নিয়েই কাব্যরচনা সার্থক, এবং এ-কাজ প্রাক্-রবীন্দ্র বাঙালি কবিদের মধ্যে কেউ পারেননি, কোনো-একজন কোনো-একটি রচনাতেও না। বাংলা সাহিত্যে চিত্রাঙ্গদা যে কত বড়ো যুগান্তকারী গ্রন্থ সুদ্ধু সেইটে উপলব্ধি করবার জন্য, মাইকেল তো বটেই, উপরন্তু হেম-গিরিশচন্দ্রাদির সঙ্গেও কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় বাঞ্ছনীয়। আর অর্জুন-চিত্রাঙ্গদাই শুধু নয়, কর্ণ, গান্ধারী, দেবযানী, দুর্যোধন প্রত্যেককেই রবীন্দ্রনাথ নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকের মধ্যে আবিষ্কার করেছেন এমন মনোলোক, আদিকবির কল্পলোকের ত্রিসীমানায় যা ছিলো না। এরা প্রত্যেকেই বর্তমানের অন্তর্গত, আধুনিক বিশ্ববাসীর স্বজাতি, এদের মুখের কথায় আমাদেরই জীবনের স্পন্দন আমরা শুনি। অসম্ভব হ'তো দুর্যোধনের জয়োল্লাস, গান্ধারীর পতিভর্ৎসনা, দেবযানীর প্রণয়-সৌরভ, যদি না কবি উনিশ শতকী পাশ্চাত্ত্য মনুষ্যধর্মে দীক্ষিত হতেন। রবীন্দ্রনাথের এ-সব কাব্য থেকে এই মহৎ শিক্ষাই আমাদের গ্রহণীয় যে চিরন্তনতা স্থাণুতার নামান্তর নয়, সাহিত্যে তাকেই চিরন্তন বলে যার মধ্যে অব্যক্ত ইঙ্গিতের পরিমণ্ডল সমস্ত ভবিষ্যৎকে আপন গর্ভে ধারণ করে, যুগে-যুগে অজাতের জন্মে, অব্যক্তের ব্যঞ্জনায় যার অপূর্ব রূপান্তর কখনোই শেষ হয় না। এই রূপান্তরের যাঁরা যন্ত্রী, বা যন্ত্র, তাঁরাও মহাকবি, এবং ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের পরে এ-আখ্যা শুধু রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। পুরাণের চিরন্তন চরিত্রগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বকালের মুখপাত্র ক'রে তুলেছেন এমনভাবে যে তারা মহাভারতের অপভ্রংশ আর নেই, তাদেরও স্বাধীন সত্তা হয়েছে, তারাও স্বতন্ত্ররূপে চিরন্তন।

আর মাইকেল? রাম-রাবণ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে-একটা

বাঁধাবাঁধি ভাব আছে, সত্যি কি তার শাসন তিনি ভেঙেছেন? সত্যি কি তাঁর রচনায় রামলক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো? সত্যি কি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলায় তাঁর আনন্দ? না, এর কোনোটাই না। কেননা মুখে যদিও তিনি সদম্ভে বলেছেন, 'I despise Ram and his rabble', কার্যত তিনি ভীরুতায় তাঁর অবজ্ঞাভাজন রামেরই সমকক্ষ, প্রভেদ শুধু এই (এবং এ-প্রভেদ মাইকেলের পক্ষে সর্বনাশী) যে রাম ধর্মভীরু আর তিনি প্রথাভীরু। মিল্টন সম্বন্ধে একটা কথা আছে যে মনে-মনে তিনি শয়তানেরই সপক্ষে ছিলেন; বোধ হয় সেইজন্যই মাইকেল স্থির করেছিলেন যে রাবণের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করা তাঁর কর্তব্য। কিন্তু তা তিনি করেছেন শুধু বচনদ্বারাই, রচনাদ্বারা নয়; মেঘনাদবধকাব্যের পদে-পদে দেখা যায় যে রাম-সীতার লোকশ্রুত মহিমায় কবি অভিভূত, এবং রাবণের দুশ্চরিত্রতার ধারণাও তাঁর মনে বদ্ধমূল। তা-ই যদি না হ'তো, তাহ'লে ঐ সুদীর্ঘ কাব্যে এই অদ্ভুত রহস্যময় প্রশ্ন উত্থাপিত না-হ'য়েই পারতো না যে রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন কেন। সম্ভোগের জন্য? কিন্তু সম্ভোগ কোথায়? সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে এসেই রাবণ যে তাঁকে একাকিনী অশোককাননে রেখে দিলেন, রাবণ চরিত্রের এই মৌল দ্বন্দ্ব কারো চোখেই ধরা পড়েনি, যতদিন না রবীন্দ্রনাথ সন্দীপের মুখ দিয়ে কথাটা বলালেন। এ-রকম অনুমানের কোনো বাধা নেই যে রাবণ সত্যিই সীতাকে ভালবেসেছিলেন, আধুনিক অর্থে ভালোবেসেছিলেন;— তাহ'লেই রাবণের ব্যবহার আমাদের চোখে সংগত লাগে, এবং তাঁর চরিত্রে মহত্ত্বের সম্ভাবনাও দেখতে পাই। কিন্তু মাইকেলি কল্পনায় এ-অনুমানের আভাসমাত্রও ছিলো না। বরং তিনি সেই চিরাচরিত জনরবকেই মেনে নিয়েছিলেন যে রাবণের সীতাহরণ তাঁর আত্মহত্যার উপলক্ষ্য এবং উপায় ছাড়া কিছু নয়, মনে-মনে তিনি রামেরই প্রেমিক, রামের হাতে মৃত্যুতেই তাঁর মোক্ষ। সেইজন্য মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রাবণের বীরত্ব একবারও উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটলো না;

পৌনঃপুনিক দীর্ঘশ্বাস এবং অশ্রুমোচনের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি আস্ফালন করেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে প্রকৃত শক্তিমত্তার এ-রকম কোনো কথা কখনোই বেরলো না, যেমন :

সুখ চাহি নাই মহারাজ।
জয়, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ।
ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাকো ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা
কুরুপতি,—দীপ্তজ্বালা অগ্নিঢালা সুধা
জয়রস—ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত—
সদ্য করিয়াছি পান,—সুখী নহি, তাত,
অদ্য আমি জয়ী।

মাইকেলের রাবণ প্রথম থেকেই জানেন যে তাঁর সর্বনাশ অবধারিত, সেটা উদ্দীপনার অনুকূল নয়, তবু সেটাকে আশ্রয় ক'রেই রাবণ সেই মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারতেন, যে-মহিমা ট্র্যাজিডির পুণ্যফল। কিন্তু ট্র্যাজিডির তপস্যা মাইকেলের পক্ষে অসম্ভব ছিলো ব'লে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন শুধু রক্ষোরাজের মনস্তাপ, পরাজয় নিশ্চিত জেনেও যে যুদ্ধ ক'রে যাচ্ছে তার মহত্ত্ব মূর্ত করতে পারেননি, যা রবীন্দ্রনাথ করেছেন কর্ণের মুখের একটি কথায় :

যে-পক্ষের পরাজয়
সে-পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।

সত্যি বলতে, রাবণের মহত্ত্বের আমন্ত্রণ মাইকেল একেবারেই গ্রহণ করতে পারেননি ; আবার প্রতিপক্ষের দুর্বলতার প্রত্যেকটি সুযোগ হেলায় হারিয়েছেন। শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণের ব্যবহার যে অপৌরুষেয়, বালীবধ যে ধিক্‌কারযোগ্য, রামচন্দ্র যে কূটনীতিতে শ্রেষ্ঠ ব'লেই রাবণকে হারাতে পারলেন, 'ভিখারী রাঘবে'র বিরুদ্ধে এতগুলি অস্ত্র পেয়েও মাইকেল ব্যবহার করেননি ; এমনকি, মেঘনাদের হত্যাকাণ্ডের নিষ্ঠুর অন্যায়টাকেও অনায়াসে আমাদের মন থেকে মুছে দিলেন স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের রামানুরাগ প্রকাশ ক'রে। রবীন্দ্রনাথের এ-কথাও গ্রাহ্য নয় যে নাস্তিক শক্তির স্পর্ধাকেই কাব্যলক্ষ্মী বিদায়কালে মালা

পরিয়ে দিলেন ; কেননা শেষ পর্যন্ত আমরা তো এই দেখলাম যে মেঘনাদ-প্রমীলা পাশাপাশি ব'সে রথে চ'ড়ে স্বর্গে গেলেন, আর মৃত্যুর পরে এতই যদি সুখ তাহ'লে আর মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করবো কেন, আর রাবণের জন্যই বা দুঃখ কিসের। এদিকে লক্ষ্মণ যখন ম'রেও বাঁচলো, তখনই জানলাম যে রাবণের চিতা জ্বলতে আর দেরি নেই, কিন্তু সেই অনির্বাণ আগুনও আমাদের মনকে ছুঁতে পারলো না, কেননা, ততক্ষণে দেব-দেবীদের কথাবার্তা শুনে আমরা বুঝে নিয়েছি যে রাম ভালোমানুষ আর রাবণটা বদমাস।

২

রবীন্দ্রনাথের পরে মাইকেল সম্বন্ধে বিচক্ষণ মন্তব্য করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বাঙালি সমালোচকদের মধ্যে তিনিই যেমন এই সুস্পষ্ট সত্যটা সাহস ক'রে উচ্চারণ করেছেন যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য 'সাধারণত অপাঠ্য', তেমনি এ-কথা বলতেও ভয় পাননি যে মাইকেল 'বাংলা ভাষাকে ভালবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেন না ; তাই তিনি বঙ্গভারতীর সেবক মাত্র, তার ত্রাণকর্তা নন।' আমিও একবার বলেছিলুম, মাইকেল বাংলা জানতেন না। বাংলা জানতেন না, এটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শোনায়, সুধীন্দ্রনাথের কথাটাই লক্ষ্যভেদী। বাংলা মাইকেলের মাতৃভাষা হ'লেও আবাল্য তিনি তাকে অবজ্ঞাই করেছেন, এবং সেই অবজ্ঞা হঠাৎ যখন জিগীষায় পরিণত হ'লো তখন যে আশ্চর্য অল্প সময়ে সেই জয়-যজ্ঞ সম্পন্ন ক'রে ফেললেন, এটা নিয়ে তাঁকে আমরা অপরিসীম বাহবা দিয়ে এসেছি। বাহবার যোগ্য কাজই বটে, কিন্তু মাইকেলের এই বঙ্গভাষাবিজয়ে জেদ যতটা ছিলো, সাধনা ততটা ছিলো না, শক্তির দৌরাত্ম্য যতটা ছিলো প্রেমের দৌত্য ততটা ছিলো না। এ যেন রাবণের সীতাহরণের মতোই ব্যাপার, একেবারে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয়া হ'লো বটে, কিন্তু 'একেই কি বলে পাওয়া' ? আবাল্য অফুরন্ত অনুশীলনের ফলে ভাষার সঙ্গে যে-অন্তরঙ্গতা জন্মে

তার অবকাশ মাইকেলের জীবনে হ'লো না ; বাংলা ভাষার অবয়বের অধ্যয়নেই কাটলো তাঁর অতিহ্রস্ব সাহিত্যিক জীবন, তার প্রাণের সন্ধান পেলেন না, কিংবা প্রাণের প্রান্তে আসতে-আসতেই মৃত্যু দিলো ছেদ টেনে। এইজন্যই তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতে কলাকৌশল যেন কল-কব্জার মতো কাজ করে ; এইজন্যই তাঁর অনুপ্রাস শিশুতোষ, উপমা দ্যুতিহীন, পুনরুক্তি ক্লান্তিকর। তাঁর সমস্ত পদ্যরচনার অভিশাপ ভাষার সেই জীবনবিমুখ সুদূরতা, ইংরেজিতে যাকে বলে পোএটিক ডিকশন। মিল্টনের অনুসরণ ছিলো তাঁর প্রতিজ্ঞা, কিন্তু কার্যত তিনি পোপের খপ্পরেই পড়েছিলেন। পোপের রীতিতে প্যারাডাইস লস্ট লেখবার শ্রেষ্ঠ ফল যা হ'তে পারে, অমিত্রাক্ষর সত্ত্বেও মেঘনাদবধ-কাব্য তা-ই। পোপের যে-সমালোচনা ওঅর্ডস্বর্থ করেছিলেন তার মধ্যে এই কথাটাই একেবারে অকাট্য যে পোপ চোখে দেখে লিখতেন না—did not write with his eye on the object—মাইকেল সম্বন্ধে হুবহু সেই কথা। মাইকেল শুধু ভাষার আওয়াজ শুনতেন—আর আওয়াজটাও খুব কড়ারকমের হওয়া চাই—তার ছবিটা দেখতেন না, ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ অনুভব করতেন না। সংস্কৃতে একই বস্তুর অনেকগুলি নাম ব্যবহার করবার রীতি ছিলো, অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষাতেও তা-ই ; কিন্তু সে-কথাগুলি পরস্পরের অবিকল প্রতিশব্দ নয়, প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র অর্থবহ, প্রত্যেকটিই একটি প্রচ্ছন্ন উপমা। অ্যাংলো-স্যাক্সন কবি সমুদ্রকে বলছেন তিমি-পথ, বলা বাহুল্য সেটা সমুদ্র কথার প্রতিশব্দ নয়, সমুদ্রের বিশেষ-একটি রূপের বর্ণনা। কালিদাসের যক্ষ মেঘকে ডাকছেন কখনো জলদ, কখনো সৌম্য বা সাধু, কখনো বা আয়ুষ্মান ; এগুলিও মেঘের ভিন্ন-ভিন্ন রূপের, এবং সেই সঙ্গে মেঘ সম্বন্ধে যক্ষের অনুভূতির অভিজ্ঞান। সংস্কৃতে বিশেষ্য-পদ মাত্রেরই কয়েকটি সেবক দেখতে পাই, যাদের বলা যায় বিশেষ্য-বিশেষণ ; সেই শব্দসম্ভারের যে-অংশ লুপ্ত হ'য়ে যায়নি বাংলায় তা এসে পৌঁচেছে নিতান্তই প্রতিশব্দরূপে, আর প্রতিশব্দ মাত্রেই অতিশব্দ ; অর্থাৎ হর্যক্ষ

শোনামাত্র যদি সিংহের হলুদ চোখ দেখতে না পেলাম, তাহ'লে সিংহকে হর্যক্ষ বলা শুধু অনর্থক নয়, রুগ্নতার লক্ষণ। বিশেষ অর্থটি যেখানে ফুটলো না, কিংবা বিশেষ অর্থটির প্রয়োজনই নেই, সেখানে ঐ সব শব্দ জড়পিণ্ডের মতো কাব্যের কণ্ঠরোধ করে। বারীন্দ্র বা সুধাংশু বললে সমুদ্র বা চাঁদের ছবি আমাদের মনে জেগে ওঠে না, বরং সঙ্গে-সঙ্গেই বাবু উপাধিধারী বঙ্গীয় ভদ্রলোককে মনে পড়ে। 'যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্মি-আঘাতে' আওয়াজ দিচ্ছে জমকালো, কিন্তু এ-ধ্বনির কোনো অনুষঙ্গ নেই, কোনো উদ্বোধনী শক্তি নেই, কোনো স্মৃতি, কোনো স্বপ্ন, কোনো মনোলীন নামহীন অভিজ্ঞতাকে এ ডেকে আনে না, একটু কষ্ট ক'রে শাদা মানেটা বুঝে নিলেই ফুরিয়ে গেলো। মৃত শব্দরাজিতে আকীর্ণ ব'লেই মাইকেলি কলরোল আমাদের কানেই শুধু পৌঁছয়, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না, এবং দেবভাষা তাঁর ক্ষেত্রে ভাষা-দানব হ'য়ে উঠেছিলো ব'লে তিনি তাকে সামলাতেই নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন, কখনোই চোখে দেখে লিখতে পারেননি। মাইকেলের সযত্ন-সজ্জিত সমস্ত বর্ণনা তাই তো সহস্রাক্ষ ছাপার অক্ষরে কেবলই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, কোনো-একটিও বাসা বাঁধতে পারলো না মনের মধ্যে।

শুধু যে বাংলাভাষার প্রকৃতি বোঝেননি তা নয়, সাহিত্যের আদর্শ নির্বাচনেও মাইকেল ভুল করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় পণ্ডিত হ'য়েও এ-কথাটা তাঁর উপলব্ধির অনায়ত্ত ছিলো যে বর্তমান কালে এপিকের জায়গা নিয়েছে গদ্য-উপন্যাস। তরুণ রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ-কাব্যকে পদ্য-উপন্যাস ব'লে তার জাতিনির্ণয় ঠিকই করেছিলেন : তিনি বুঝেছিলেন যে প্রকৃত এপিক পৃথিবীতে দুটি কি তিনটিমাত্র আছে, পরবর্তী কাব্যকাহিনীগুলি নামত মহাকাব্য হ'লেও আসলে পদ্য-উপন্যাস, রঘুবংশও তা-ই, ক্যান্টরবরি টেলসও তা-ই, এমনকি প্যারাডাইস লস্টও তা-ই। কিন্তু মাইকেলের ধারণায় মহাকবিমাত্রেই মহাকাব্যের লেখক ছিলেন ব'লে তিনি মহাকাব্য লিখতে তো পারলেনই না,

উপরন্তু মহৎ পদ্য-উপন্যাস লিখে মহাকবির মর্যাদালাভও সম্ভব হ'লো না তাঁর পক্ষে। যদি তিনি ভেবে দেখতেন, কেন প্যারাডাইস লস্টের পরেই ইংরেজি ভাষার উল্লেখযোগ্য 'মহাকাব্য' পিত্তপ্রবণ ডানসিআড, যদি ভেবে দেখতেন তাঁর উপাস্য মিল্টন আর উপহাস্য পোপে সত্যিকার প্রভেদটা কোথায়, তাহ'লে হয়তো অনেক পণ্ডশ্রম তাঁর বেঁচে যেতো। যদিও অনেকগুলি ভাষা শিখেছিলেন এবং পড়েছিলেন বিস্তর, তবু এ-কথা মনে করতে পারি না যে তিনি ঠিকমতো পড়াশুনো করেছিলেন কিংবা পড়াশুনোকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। তাঁর পত্রাবলী মিল্টন-ভজনায় উচ্ছল, কিন্তু শেক্সপিঅর সম্বন্ধে (এমনকি নাটকের প্রসঙ্গেও) স্বল্পভাষী; বায়রনকে তিনি কিঞ্চিৎ আমল দেন, কিন্তু কীটস, যাঁর সঙ্গে মিল্টনের আত্মীয়তা অপ্রতিরোধ্য, কীটসের নামও মুখে আনেন না। দান্তে, হ্যুগো, টেনিসনকে লক্ষ্য ক'রে যে-সব সনেট লিখেছেন তাতে উদ্দিষ্ট কবিদের বিশিষ্টতা কিছুই প্রকাশ পায়নি, প্রশস্তির মুখস্থ-পাঠে সকলকেই এক মনে হয়। এ থেকে এমন নিদারুণ সন্দেহও মনে উঁকি দেয় যে মাইকেল বিদ্যার অনুধাবন করলেও রুচি অর্জন করেননি: এবং এটা চিন্তনীয় যে বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভূত শক্তির প্রভূত অপব্যয়ের হেতু কি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যা বলেছেন তা-ই, অর্থাৎ চারিত্রগুণের অনটন, না কি রুচির অনিশ্চয়তা।

তাছাড়া, চারিত্র বা রুচির ন্যূনতা সিদ্ধির অনতিক্রম্য অন্তরায় হয়তো হ'তো না, যদি মাইকেল কোনো বিশ্বাসের বিশ্বম্ভর আশ্রয় পেতেন। যে-বিশ্বাসের জোরে দান্তের নরক প্রভাবে অলৌকিক হ'য়েও প্রাকৃত-পন্থী উপন্যাসের মতো, এমনকি চলচ্চিত্রের মতো, প্রত্যক্ষ, যে-বিশ্বাসের জোরে মিল্টন বাইবেলের রূপকথা নিয়ে অমর কাব্য বানিয়েছেন, তার কণামাত্র অংশও যদি মাইকেলের থাকতো তাহ'লে তাঁর কাব্যের রূপ-প্রতিমায়, অন্তত মুহূর্তের জন্য, প্রাণসঞ্চার না-হ'য়েই পারতো না। বাংলা সাহিত্যের এটাই বোধহয় শোচনীয়তম দুর্ঘটনা যে মধুসূদন দত্ত

কোনো ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করতে পারলেন না, না স্বজাতীয়, না বিজাতীয়; যখন তিনি রাম-রাবণের যুদ্ধ নিয়ে কাব্যরচনায় লিপ্ত, তখনও এ-কথা ভেবে তাঁর আত্মপ্রসাদ যে তিনি একজন 'jolly Christian youth', হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি সূচ্যগ্র অনুকম্পা তাঁর নেই, ভাবখানা এইরকম যেন লক্ষ্মণ মেঘনাদ সীতা প্রমীলাকে নিয়ে তিনি লেখা-লেখা খেলা করছেন বটে, কিন্তু সত্যি-সত্যি তাঁর জীবনে তারা কিছুই এসে যায় না। পক্ষান্তরে, জন্মদোষে খৃস্টান ঐতিহ্যকে এতখানি শোষণ ক'রে নেবার সম্ভাবনাই তাঁর ছিলো না যাতে কাব্যের প্রেরণা সে-অঞ্চল থেকে আসতে পারে; মুহর্‌রমের কাহিনী নিয়ে কাব্যরচনার কথাও তাঁর মনে এসেছে, কিন্তু যীশুর জন্ম নিয়ে কখনোই না। ঐতিহ্যকে বাড়াতে কি বদলাতে হ'লে যতটা আছে তাকে অধিকার করা চাই, আর ঐতিহ্য যখন বাড়েও না, বদলায়ও না, তখনই তার অধঃপাত ঘটে প্রথার অন্ধকূপে। মাইকেল কোনো ঐতিহ্যকে পাননি ব'লেই তাঁকে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিলো প্রথার হাতে; তাই তাঁর রাম লক্ষ্মণ সীতা কিংবা রাবণ মেঘনাদ প্রমীলা কেউ জীবন্ত নয়, তাই এতগুলি কাব্যে ও নাটকে একটিও চরিত্রসৃষ্টি তিনি করতে পারেননি, তাই তাঁর নরকে দুঃখের অগ্নিশুদ্ধি নেই, আছে শুধু ন্যক্কার, স্বর্গে নেই সৌন্দর্যের অমরতা, শুধু আছে লিপি-পুস্তিকার নীতিকথা। (স্বর্গে সতীদের জন্য শুধু মনোরম প্রমোদ-কানন নয়, অপরিমিত চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র ব্যবস্থা করতেও তিনি ভোলেননি!) বীরাঙ্গনাকাব্য আকারে-প্রকারে অনেকটা অগ্রসর, তবু তারার খেদোক্তির প্রথম চার পংক্তি মনে যে-আশা জাগায়, সে-আশা শেষ পর্যন্ত চুরমার হ'য়ে যায় গতানুগতির পাষাণে, এবং কাব্যটি আদ্যোপান্ত প'ড়ে ওঠবার আগেই আমরা উপলব্ধি করি যে বীরাঙ্গনারা সকলেই আসলে পতিদেবতার অশ্রুসর্বস্ব সেবাদাসী, আর পড়তে-পড়তেই ভুলে যাই কে দুঃশলা, কে দ্রৌপদী, আর কে-ই বা শকুন্তলা; সকলেই এক কথা বলছে, এবং সকলের কথাই একই

রকম গতানুগতিক। ব্রজাঙ্গনার প্রেম-লীলা এবং চতুর্দশপদীর দেশপ্রেম আর প্রকৃতিবর্ণনাও—আবার সেই কথাই বলতে হয়—গতানুগতিকতারই পরাকাষ্ঠা, নাটক ক'খানাও তা-ই, উজ্জ্বল প্রহসন দুটির পরিসমাপ্তিও ব্যতিক্রম নয়।

৩

তবু এ-কথা অবিস্মরণীয় যে মাইকেল শক্তিধর পুরুষ, বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রধান। কিন্তু তাঁর প্রাধান্যের স্বরূপ বুঝতে হবে, তবে তো তাঁকে আমরা নিজেদের কাজে লাগাতে পারবো। জীবদ্দশায় দেশব্যাপী জয়-জয়কার সত্ত্বেও এমন অনুমান অসংগত মনে হয় যে সমসাময়িকদের মধ্যে বিদ্যাধর আর সিদ্ধপুরুষের প্রভেদ সম্বন্ধে কেউই সচেতন ছিলেন না। রাজনারায়ণ বসুর বন্ধুতা বা বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব তাঁদের সমালোচক-দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করেনি; অভিনেতা কেশব গাঙ্গুলি পর্যন্ত দত্তজর নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু এমন-একটি কাণ্ড মাইকেল করেছিলেন যার সামনে কোনো সন্দেহ টিকলো না, কোনো আপত্তি দাঁড়াতে পারলো না। সকলেই জানেন যে সেটি তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্‌ভাবনা। এ-উদ্‌ভাবনা যে ঠিক কী-কারণে মাইকেলকে অক্ষয্য যশের অধিকারী করলো তা অবশ্য সমসাময়িকেরা স্পষ্ট বোঝেননি, ভাবেননি যে মিলবর্জনটাই খুব বড়ো কথা নয়, কেননা মিল তো অনুপ্রাসেরই রকমফের, এবং কোনো-না-কোনো শ্রেণীর অনুপ্রাস পদ্য-গদ্য লিখিত-কথিত সর্বপ্রকার ভাষার মর্মমূলে প্রোথিত। পদান্ত অনুপ্রাসের অভাব মেটাতে গিয়ে মাইকেল যে-ধরনের বাক্‌বাদনের সাহায্য নিয়েছিলেন তাতে সরস্বতীর হাড়ে বাতাস লাগেনি:

অনুপ্রাসের পরিবর্তে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি শুধু নয়, * 'কড়মড়মড়ে' 'ঝক ঝক ঝকে' ইত্যাদি বালভাষিত পদাবলীও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিলো। মিলের কথাটা তাই খুব বড়ো কথা নয়; মাইকেলের যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিলো 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'-র একঘেয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ-যতির ঊর্মিলতা। অবশ্য এ-বিষয়ে সমসাময়িক আলোচনা কম হয়নি, কিন্তু যতিপাতের এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে-সঙ্গেই যে ছন্দে প্রবহমাণতা এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলো এ-কথাটা তৎকালীন অনুসন্ধানীর দৃষ্টিগোচর হয়নি, হেমচন্দ্রের না, মাইকেলের নিজেরও না। প্রকৃতপক্ষে, অন্য-কোনো কারণে যদি না-ও হয়, শুধু বাংলা ছন্দে প্রবহমাণতার জনক ব'লেই মাইকেল উত্তরপুরুষের প্রাতঃস্মরণীয়, এবং যদি অমিলতার দিকে অত্যন্ত বেশি জোর না-দিয়ে তাঁর সহজীবীরা প্রবহমাণতার তত্ত্বটা আবিষ্কার করতেন, তাহ'লে শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শ বহুপূর্বেই স্বতঃসিদ্ধ হ'তো যে এ-ছন্দের যথার্থ নামকরণ অমিত্রাক্ষর নয়, অমিতাক্ষর।

কিন্তু মাইকেলি অমিত্রাক্ষর বাংলা ছন্দের নবজন্মের যবনিকা-উত্তোলক মাত্র, আসল পালা আরম্ভ হ'লো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। মাইকেলের যে-কোনো কাব্যের যে-কোনো অংশের সঙ্গে মানসীর 'নিষ্ফল কামনা'র অমিত্রাক্ষরকে তুলনা করলে দুয়ের মধ্যে ব্যবধান

* যেমন:

ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা;
কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ!
প্রবল পবন বলে বলীন্দ্র পাবনি
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি
আবৃত, পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদামে;

ইত্যাদি। 'রঞ্জিত রঞ্জনরাগে,' অর্থাৎ কিনা 'রঙের রঙে রাঙানো'!

অন্তত একশো বছরের মনে হয়। কী-উপায়ে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে চৌদুনে চালিয়েছিলেন সে-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত হ'তে পারে, কিন্তু এ-কথা নিশ্চিত যে মাইকেলের তাতে কোনো হাত ছিলো না। এটা উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের কিশোর রচনায় হেমচন্দ্রের প্রভাব পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু মধুচক্রের মক্ষিকাবৃত্তির চিহ্নমাত্র নেই ; তাঁর জন্মের অব্যবহিত পূর্বে মধুসূদন যদি যবনিকা উত্তোলন না-ও করতেন তবু রবীন্দ্রনাথের পালা যখন এবং যে-ভাবে আরম্ভ হবার ঠিক তা-ই হ'তো। আসল কথা, বাংলা ভাষার প্রাণের ছন্দের সঙ্গে মাইকেল তাঁর অমিত্রছন্দকে মেলাতে পারেননি, তাই তাতে শুধু আন্দোলন আছে, স্বাচ্ছন্দ্য নেই ; বেগ আছে প্রবল, কিন্তু গতির অনিবার্যতা নেই ; এ যেন নদী নয়, আবর্ত, সেখানে নৌকা ভাসালে ডুবে যদি না মরি তাহ'লে নিরাপদেই ঘরে ফিরবো, কেননা অলক্ষ্যে অসীমের দিকে তা টেনে নিয়ে যায় না। আমি বলতে চাই, মাইকেল পড়বার পর পুরোনো জীবনের নিশ্চিন্ত পুনরাবৃত্তি সম্ভব, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুর একবার যার প্রাণে লেগেছে, জীবনের মতো অন্য মানুষ হ'য়ে গেছে সে। মাইকেল পড়া না-পড়ায় শিক্ষার তারতম্য ঘটে ; রবীন্দ্রনাথ পড়া না-পড়ায় জন্ম-জন্মান্তরের ব্যবধান।

আমি ভুলিনি যে মাইকেল পুরোমাত্রায় সচেতন শিল্পী। শুধু যে বাংলা ছন্দে যুক্তবর্ণের পরম রহস্যের তিনি আবিষ্কর্তা তা নয় ; বাংলা স্বর-ব্যঞ্জনের ফলদ প্রয়োগ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন ব'লেই

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্বরী ; বহিল চারি দিকে গন্ধবহ

তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি,

আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্বরী, সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে

লিখে কঠিনতর ধ্বনিসন্ধানের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু যে-কোনো কাজ সর্বপ্রথম করতে গেলে তাতে আতিশয্য প্রায় অরোধ্য : প্রথম

কথা-বলা সিনেমায় যেমন সমস্তটাই ছিলো নিছক চ্যাঁচামেচি, তেমনি মাইকেলও যুক্তবর্ণের আশ্চর্য যন্ত্রটি প্রথম হাতে পেয়ে হৈ-চৈ আর ধ্বনিসৌষম্যের প্রভেদ ভুলেছিলেন। তা না-হ'লে অমিত্রাক্ষরের এই পূজারী মার্লো শেক্সপিঅর ওএবস্টরকে অবহেলা করতেন না, এবং এটাও বুঝতেন যে একই যন্ত্র থেকে তূরী-নির্ঘোষ আর সেতারের মীড় বের করতে পেরেছিলেন ব'লেই মিল্টন স্বর্গীয়। কেন চতুর্থ সর্গে সীতা সরমার সমস্ত সম্মিলিত ক্রন্দন

But silently a gentle tear let fall

এই একবিন্দু মিল্টনী অশ্রুর সমকক্ষ নয় ; পঞ্চম সর্গে

ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয় ! চিত্রলেখা, উর্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিয়া নূপুর কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ ; খুলিয়া কাঁচলি,
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে !

ইন্দ্র-দম্পতীর বাসর-শয্যার এই বর্ণনা কেন কীটসের And Jove grew languid-এর তুলনায় মনে হয় যত অলংকৃত ততই দরিদ্র, তার কারণ শুধু ওঅর্ডস্বর্থ-উল্লিখিত প্রত্যক্ষদৃষ্টির অভাবই নয়, সেই সঙ্গে এ-কথাও জুড়তে হয় যে মাইকেলের ছন্দ ঢাকের বাদ্যির মতো, জোর আওয়াজ, কিন্তু রেশ নেই। মেঘনাদী ডঙ্কানাদে তাই আগামীর আগমনী বাজলো না, তার ঐশ্বর্যের নির্বীজতা ঘুচলো না কিছুতেই, এবং রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের ভাষা-পাষাণীর ঘুম ভাঙালেন, তখন দেখা

গেলো ছন্দের প্রবহমাণতার সঙ্গে মিলের কোনো মৌল বিরোধ নেই, বরং প্রবহমাণতাই সেই শক্তি যাতে পদে-পদে মিল দিয়েও মিল লুকিয়ে রাখা যায়, আর সেই সঙ্গে এ-কথাও আমরা বুঝলাম যে যতিপাতের স্বৈরিতা শ্বাসনালীর চমকপ্রদ ব্যায়াম নয়, তার আসল কাজ কাব্য-ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষার ঘটকালি।

অবশ্য মাইকেলও মনে-মনে অনুভব করেছিলেন যে যতির যদৃচ্ছতা দরজা দিয়ে ঢুকলেই মিলের ঝাঁক জানালা দিয়ে উড়ে পলায় না, শুধু তা-ই নয়, মিল-সংস্থাপনের পাশ্চাত্ত্য বৈচিত্র্য প্রবহমাণতার স্বাধীনতাই দাবি করে: নয়তো সনেটগুচ্ছ তিনি লিখেছিলেন কেমন ক'রে। উপরন্তু, তাঁর পত্রাবলী প'ড়ে বোঝা যায় যে গদ্যের ভূভারতের সঙ্গে কাব্যের স্বর্ণলঙ্কার সেতুবন্ধই ছিলো তাঁর অচেতন প্রয়াস, এবং সেই অসম্পূর্ণ, অব্যবহার্য, পরিত্যক্ত সেতুরই আমরা নাম দিয়েছি মাইকেলি অমিত্রাক্ষর। যদিও রবীন্দ্রনাথের কোনো কীর্তির পক্ষেই মাইকেলের অগ্রগামিতা অপরিহার্য নয়, তবু এ-কথাও সত্য যে অনুজ যা-কিছু করেছেন তার কোনো-কোনো অংশ অগ্রজকে দিয়েও হ'তে পারতো, যদি তিনি সুস্থ মনে দীর্ঘজীবী হতেন। শুধু যে তথাকথিত অমিত্রাক্ষরকে সত্যিকার সার্থকতায় পৌঁছিয়ে দিতে পারতেন তা নয়, যাকে আমরা আজকাল তিনমাত্রার ছন্দ, অর্থাৎ মাত্রাবৃত্ত বলি, তাও তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিলো, * এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, কাব্যে যে-গুণ তাঁর

* যেমন :

কেনে এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের বালা ?

(ব্রজাঙ্গনা—'কুসুম')

কখনো বর্তায়নি, সেই স্বাচ্ছন্দ্যকে অর্জন করেছিলেন গদ্য-মহাদেশের দুই বিপরীত সীমান্ত-প্রদেশে। প্রহসন দুটির প্রাণপূর্ণ সংলাপ প'ড়ে যেমন মনে হয় যে পদ্মাবতী কৃষ্ণকুমারীকে নিয়ে পণ্ডশ্রম না-ক'রে ব্যঙ্গবিদ্রূপের লীলাখেলাতে মাতলেই তাঁর প্রতিভার ধর্মরক্ষা হ'তো, তেমনি আবার হেক্টর-বধের গম্ভীর, উদার, সুশৃঙ্খল গদ্য প'ড়ে বলতে লোভ হয় যে দৈবাৎ গদ্যকাহিনীতে হাত দিলে ইনিই হতেন বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা—অন্তত, আদ্যন্ত হোমর অনুবাদ ক'রে উঠতে পারলেও সে-গ্রন্থ যে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের মতোই বাঙালির একটি রত্নখনি হ'তো তাতে সন্দেহ নেই। ···কিন্তু মাইকেল আমাদের হতভাগ্যতম কবি; ব্যস্ত, উদ্ধত, অব্যবস্থিত উৎসাহে এই প্রায়-প্রৌঢ় যুবক তাঁর সাহিত্যিক বিদ্যুৎ-যুদ্ধ চালিয়েছেন, এক-এক মাসে এক-একটা নতুন

এ-কবিতাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কবি অশোকবিজয় রাহা। এ-ছাড়া আরো দুটি রচনা লক্ষণীয় :—

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ দেবি!
কহো কি ছন্দ মনানন্দ দেবে
মনীষীবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে ?

('দেবদানবায়ম্')

এখন্ কি আর্ নাগর্ তোমার্
আমার্ প্রতি তেমন্ আছে,
নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে।

(গান—'একেই কি বলে সভ্যতা ?')

মাত্রাবৃত্তে যুক্তবর্ণের প্রয়োগ আর-একটু হ'লেই মাইকেলি আবিষ্কারের অন্তর্গত হ'তো, এমনকি 'বেঠিক পথের পথিক'-এর ছন্দও তাঁর হাতে ধরা পড়তে পড়তে ফশকে গেলো।

দেশ জয় ক'রে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন রাজপুত্র থেকে জুতোওলা পর্যন্ত সকলকে···কিন্তু শেষ রক্ষা হ'লো না। তাঁর কর্মসূচীতে দেখতে পাই শুধু পরীক্ষার পর পরীক্ষা, গদ্যে ও পদ্যে, নাট্যে ও কাব্যে ; অনেকটা তার নিছক চর্চা, নিতান্তই লিখতে শেখা, প্রাক্-মানসী রবীন্দ্র-রচনার সগোত্র, অনেকটাই অবিমিশ্র অপব্যয়, যে-অপব্যয় যে-কোনো সৃষ্টিতে অপরিহার্য। যেদিকে তাঁর সহজাত ক্ষমতা সেদিকে যথোচিত মনোযোগ নেই ; যেটা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, যেন বাজি রেখে সেইটে করবার দিকেই ঝোঁক। ট্র্যাজিডি তাঁর ধারণার মধ্যেই কোনোকালে আসেনি, অথচ ট্র্যাজিডি লিখতে গেলেন ; পক্ষান্তরে, নাটকের ভাষা পদ্য হওয়া উচিত—এমন পদ্য যা কানে শোনাবে গদ্যের মতো অথচ মনের উপর কবিতার মতো কাজ করবে—এই অত্যন্ত উৎসাহজনক অভিমত ঘোষণা ক'রেও কেন যে কখনো কাব্য-নাট্য লিখলেন না, কিংবা লিরিক প্রেরণাকে আধুনিক কাব্যের বিশল্যকরণী ব'লে অনুভব করা সত্ত্বেও কেন কার্যত তাঁর সে-প্রেরণা আবদ্ধ রইলো শিশুপাঠ্য পদ্যসন্দর্ভে, তা মাইকেলের ভাগ্যবিধাতা ছাড়া সকলেরই অগোচর। তাঁর জয়যাত্রা অত্যন্ত অস্থির ব'লেই উত্তেজক ; কেননা যে-ভাষার সওয়ার হ'য়ে বেরিয়েছেন সে সর্বদাই সচেষ্ট তাঁকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে, যেহেতু তাঁর প্রতিজ্ঞা গায়ের জোরেই তাকে অনভ্যস্ত পথে চালাবেন। যতদিনে ভাষাকে তিনি প্রায় বাগে এনেছেন, চোখের সামনে পথ দেখা যাচ্ছে, যতদিনে নিজের ব্যর্থতার কাছে শিক্ষা নিয়ে-নিয়ে প্রায় প্রস্তুত হয়েছেন সত্যিকার সফলতার জন্য, ততদিনে তাঁর জীবনে যে-দুর্ভাগ্য ঘিরে এলো তার অবসান হ'লো একেবারে মৃত্যুতে। যে-সত্যের আভাস তিনি পেয়েছিলেন তা আভাস হ'য়েই রইলো ; সাহিত্যরচনার যে-সব রীতি-নীতি উপলব্ধি করেছিলেন, তার প্রয়োগের অন্তরায় হ'লো ভাষাকে আত্মকরণের অক্ষমতা; সাহিত্যশক্তির যে-বিভিন্ন উপাদানগুলিকে তিনি স্বতন্ত্রভাবে পরখ ক'রে দেখেছিলেন, যথাযথমাত্রায় সেগুলির সমন্বয়ের সময়ই হ'লো না—তাঁর সমগ্র

সাহিত্যিক জীবন বলতে গেলে মাত্রই তো পাঁচ-সাত বছরের। তাই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সিদ্ধান্ত যদিও স্বীকার্য যে 'বাঙালি কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই' এবং এইখানেই তাঁর ঐতিহাসিক প্রাধান্য, তবু আন্তরিক বিচারে তাঁকে অপরিণত অকালমৃত কবির মতোই আমাদের লাগে আজকাল, নিজের শক্তির ব্যবহার যে জানে না, নিজের উদ্দেশ্যকে নিজেই পরাস্ত করে, যাকে আমরা চড়া গলায় প্রশংসা করি, আর তাতেই আমাদের দায়িত্ব ফুরোয় ব'লে যার জন্য আমাদের দুঃখ হয়।

আলোচনা

বাংলা ছন্দ

রচয়িতা হিসেবে কবির উপরেই যে কাব্যের প্রকৃতিবিশ্লেষণে সবচেয়ে বেশী নির্ভর করা চলে তা যেমন নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা যেমন হতাশার অগ্রদূত, কাব্যের আকৃতির ব্যাপারেও তাঁদের কাছে আমরা বেশী ইঙ্গিত আশা করতে পারি না; তার জন্যে দ্বারস্থ হতে হবে বৈয়াকরণের।

হয়ত তাই, কবি যেন তাঁর রচনা শেষ করেই দায়মুক্ত। যা তিনি দিচ্ছেন, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের উপর তার কত কি প্রতিক্রিয়া, তাঁর কাব্যের প্রকৃতি কত কি ভাবে বিচার্য্য, আঙ্গিকের দিক থেকেই বা তিনি কি কৌশল নিয়েছেন, কি বিশিষ্টতা দিয়েছেন এ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন না তিনি। তাঁর নিজে কিছুমাত্র সচেতন ধারণা নাও থাকতে পারে—এ-সবে তিনি হয়ত 'পুষ্পসম অন্ধ'।

পক্ষান্তরে এ-কথাও হয়ত বলা যায় কবি যদি একটু সচেতন হন, কাব্যের প্রকৃতিগতই হোক কি আঙ্গিকের সম্পর্ক হোক, যে-কোনো তত্ত্বের মূল মর্ম্ম উপলব্ধি তাঁর পক্ষে যেমন সহজ, স্বাভাবিক, আর কারও পক্ষে তা নয়। সে ক্ষেত্রে আমরা অকবি সমালোচকের দান অস্বীকার না-করেও কবির কাছেই খোঁজ করব বিশেষ ইঙ্গিতটি।

এ-কথা কিছুটা উপলব্ধি করা যায় যখন কবি বুদ্ধদেব বসু আর কারও কাব্য সাহিত্য আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অনেক সমালোচকই চেষ্টা-করেছেন; তাঁদের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তত্ত্বভেদী আলো ফেলেও যে সব সৌন্দর্য্যের সন্ধান মেলেনি বুদ্ধদেববাবুর অনেক বিক্ষিপ্ত, অসমাপ্ত রবীন্দ্রালোচনায় তারা আশ্চর্য্য ফুটে উঠেছে। কবিদের সুবিধেই এই—কোথা থেকে এসেছে কোন সৌন্দর্য্য, কি কি কারণে সে সৌন্দর্য্য সম্ভব তা না বলতে পারেন; সৌন্দর্য্যটা আছে কোথায় এটা বিশেষ করে তাঁদের পক্ষেই ধরে দেওয়া সহজ—তাঁরা ঠিক চিনতে পারেন। জাত-সমালোচক না-হয়েও রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব প্রাচীন সাহিত্যের এত সৌন্দর্য্য উদ্ধার। কোনো কবি যখন কাব্যের প্রকৃতি বা আকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে উদ্যত হন তাকে তাই উৎসাহিত হবার কারণ থাকে।

কবি বুদ্ধদেব বসু কিছুকাল থেকে প্রত্যক্ষভাবে কাব্যের আঙ্গিক নিয়ে কিছু আলোচনা করছেন। এর মধ্যে সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য এবং আমাদের আলোচ্য। সাহিত্য সম্পর্কিত অন্য অনেক বিষয়ের মত ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করেই বিচার করেছেন—ছান্দসিকের অনেক খুঁটিনাটি হয়ত তাঁর কাছে কিছুটা অবান্তর, হয়ত সবটাতে তাঁর মত না মিলতে পারে, হয়ত সবটার সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি পরিচয়ও না থাকতে পারে। কিন্তু যে-কোনো ছন্দের মূল মর্ম্ম উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল (ছন্দ বইটিতে যার ভূরি ভূরি নিদর্শন) কবি হিসাবে বুদ্ধদেববাবুর পক্ষেও তার কিছুটা অন্তত সম্ভব এবং সে পরিচয় ঐ প্রবন্ধটিতে, এও আমার বিশ্বাস।

বুদ্ধদেববাবুর ঐ প্রবন্ধে যে সমস্ত মন্তব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমার মনে প্রশ্ন জাগে আগে জানাই। অমূল্যধনবাবুর 'যৌগিক অক্ষর' এবং প্রবোধবাবুর 'যুগ্মধ্বনির' পরে তিনি বিশেষভাবে 'যুক্তবর্ণ' কথাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই কারণে যে 'তার মূল্যভেদেই পয়ারের গাম্ভীর্য্য ও মাত্রাবৃত্তের ঝংকার'। কিন্তু এখানে তিনি হয়ত সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছেন যুক্তবর্ণবিশিষ্ট শব্দের লিখিত আর শ্রুত রূপ এক নয়—ছন্দ, পুণ্য ইত্যাদি শব্দের শ্রুত রূপ ছন্‌দ, পুণ্‌ণ্য ইত্যাদি। সাময়িক বললাম এই কারণে যে কৌতুকের বিষয় বুদ্ধদেববাবুই বিষয়টির প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক প্রবন্ধে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যাই হোক, মূল্যভেদ (অন্তত মাত্রার বিচারে) যুক্তবর্ণের বললে হয়ত ঠিক হবে না। আর শব্দের সুরুতে যুক্তব্যঞ্জন যে নিঃসংশয়ে একমাত্রা সে ত ঐ প্রবন্ধের পাদটিকাতেই স্বীকৃত।

তারপর ছড়ার ছন্দে যথেষ্ট ফাঁক থাকে, এ-কথার সার্থকতা কেবলমাত্র তখনই যখন আমরা ছড়া আগেকার দিনের মত সুর করে টেনে-টেনে আবৃত্তি করি। কিন্তু এটাই কি ছন্দে গাঁথা কবিতা আবৃত্তির সঠিক পদ্ধতি? ইতিপূর্ব্বে দু'একটি প্রবন্ধে আমি এ-বিষয়ে আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে এখানে উত্তর করা যেতে পারে—না, নিশ্চয়ই নয়, অন্তত আজকাল আমরা এতে সুর সম্পূর্ণ বর্জ্জন করে চলি। 'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধটিতে মন্তব্য করা হয়েছে স্বরবৃত্তের সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের সাদৃশ্য যুগ্মধ্বনির মূল্যে আর পয়ারের সাদৃশ্য মাঝে-মাঝে ফাঁক থাকায়। উপরে যে আবৃত্তির কথা বিবেচনা করা হোল তাতে ঠিক বিপরীতভাবে মন্তব্য করা যায় যে ছড়ার ছন্দের পয়ারের সঙ্গে সাদৃশ্য যুগ্মধ্বনির মূল্যে (অতিরিক্ত সংশ্লেষপ্রবণতার) আর মাত্রাপ্রধান ছন্দের সঙ্গে সাদৃশ্য ফাঁকবিহীন সুরবর্জ্জিত ঝোঁকপ্রধান উচ্চারণে। ছড়ার ছন্দে যাকে বলা হয়েছে ফাঁক-ভরানো তাকে বরং

মনে করা যেতে পারে দৃশ্যত ফাঁপানো। এর প্রমাণ—বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা—পংক্তিটি 'দ্রুত তালে এক নিঃশ্বাসে স্বরবৃত্ত রীতিতে পড়ে ফেলা যায়'। বিশেষ করে এখানেই কি দ্রুত তালের প্রয়োজন? ছড়ার ছন্দে ঢংই হোল দ্রুততালে, স্বরাঘাত দিয়ে ফাঁপানো পর্বকে চেপে আবৃত্তি। দ্বিতীয় পংক্তি — শিব ঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা—এখানে 'বিয়ের বাসরে' এসে স্বরবৃত্ত যে টিকল না তার কারণ পর্বটি এমনভাবে ফাঁপানো হয়েছে যে তাকে চেপে যথেষ্ট কমানো অসম্ভব; হলন্ত অক্ষরকে যেভাবে চেপে পড়া চলে স্বরান্ত অক্ষরকে তা নয়।

কিন্তু—মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠলো জ্বলে—একে স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ মনে করায় দোষ কি? তারপর—স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী মরণযাত্রী দলে—সম্বন্ধেও একই মন্তব্য।

পক্ষান্তরে—বেঠিক পথের পথিক আমার—ইত্যাদিকে ধ্বনিমাত্রিক রীতিতে পড়তে কি অসুবিধে? 'নির্ফাঁক স্বরবৃত্ত লিখতে-লিখতে যদি কখনো একটিও স্বরান্ত শব্দ এসে পড়লো অমনি তা স্বরবৃত্ত আর রইলো না', এ-কথার কি তাৎপর্য্য আমি বুঝতে পারি না।

প্রবন্ধটির ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে চেষ্টা করা হয়েছে প্রমাণের যে ছড়ার ছন্দে পাঁচ সিলেবলের পর্ব যথেষ্ট ব্যবহার সম্ভব। কিন্তু এর সমর্থক দৃষ্টান্তগুলির প্রতিটিতেই লক্ষ্য করা যাবে 'ইয়ে', 'ইও', 'ইই', 'উও' ইত্যাদি ধরনের পাশাপাশি দুটে স্বরধ্বনি, যারা ছড়ার ছন্দে প্রকৃতপক্ষে একটি যুগ্মধ্বনিরই কাজ করে। সুতরাং সে সব ক্ষেত্রে ছন্দের ব্যবহারে ওগুলিকে যুগ্মধ্বনি বিবেচনা করাই সঙ্গত। পাঁচ syllable যে অচল তা ঐ দৃষ্টান্তগুলিতে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনির বদলে দুটো ভিন্ন রকমের syllable বসাতে গেলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। অবশ্যি রবীন্দ্রনাথ এভাবেও যে পাঁচ syllable ব্যবহার করেননি তা নয়—

শত্রু আমারে করগো জয়
তুমিই আমার বন্ধু
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ

কিন্তু এখানেও ছড়ার ছাঁদ ঠিক বজায় আছে কি?

অবশ্য তিন syllable-এর পর্ব্বকে ব্যতিক্রম স্বীকার না করাটা খুবই যুক্তি-সঙ্গত, এমন কি দু' syllable-এর পর্ব্বও যে এ ছন্দে চলে তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর—

…'এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে'
…'হও তুমি সাবিত্রীর মতো'

বুদ্ধদেববাবুর অনেক দোহাই সত্ত্বেও এগুলোকে

…এলো তার দৌ। রাত্ম্য নিয়ে
…হও তুমি সা। বিত্রীর মতো

এ রকমে ভাগ না করে উপায় থাকে না। আর 'মরি মরি অনঙ্গ দেবতা'—একে রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার এঁরা কেন অন্যভাবে পড়বেন জানি না, আমার ত মনে হয় ছড়ার ছাঁদ বজায় রাখবার জন্য যদি আমি 'মরি মরি। অনঙ্গ দে। বতা' এভাবে ভাগ করি অন্তত অমূল্যধনবাবুর সমর্থন পাব।

'চিরনিদ্রার', 'ওগো যৌবন' ইত্যাদি চার সিলেবল থাকা সত্ত্বেও যে শ্রুতিকটু তার কারণও অমূল্যধনবাবু দিয়েছেন। ছড়ার ছাঁদে পর্ব্বাঙ্গের প্রথম অক্ষরটি যৌগিক হলে তার উপর স্বরাঘাতের দরুণ বাগ্‌যন্ত্রের যে উত্তেজনা তা প্রথম যৌগিক অক্ষটির সংশ্লেষণে সহযোগিতা করতে পারে, কিন্তু ঠিক তার পরবর্ত্তী দ্বিতীয় যৌগিক অক্ষরের সংশ্লেষণ যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। তাই ছড়ার পর্ব্বাঙ্গে 'নিদ্রার' শ্রুতিটুকু, 'ঘুমের' অনায়াসেই চলে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা। প্রবোধবাবুর অনেক মতামতে অসঙ্গতি দেখিয়ে বুদ্ধদেববাবু বিশেষভাবে মন্তব্য করেছেন, 'স্বরবৃত্তের স্বরূপ নিয়ে প্রবোধচন্দ্রকে নতুন করে ভাবতে হবে'। এ দাবী অযৌক্তিক নয়। তবে বুদ্ধদেববাবু লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না, স্বরবৃত্তের স্বরূপ অমূল্যধনবাবুতে যা প্রকাশিত তাতে অনেকদিন আগেই এ সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে মনে করি।

কিন্তু এ-রকম কিছু-কিছু বাদ দিয়েও প্রবন্ধটিতে এমন অনেক জিনিষ আছে যা নিঃসংশয়ে আমাদের ছন্দোবোধের সহায়ক। প্রবোধবাবুর মন্তব্যের প্রতিবাদে 'হৃদয় যমুনা'কে যে রীতিমত পয়ার ছন্দে রচিত বলা হয়েছে তা অযৌক্তিক মনে হয় না। আর 'শব্দ'কে 'শবদ' লেখা ছন্দে মাত্রিক উন্মুখতার পরিচায়ক বলেও মনে করবার কারণ নেই। ব্যবস্থা যেখানে তিনমাত্রা, মাত্রাপ্রধানে নয়, বরং পয়ারেই 'শব্দ'কে 'শবদ' পড়তে পারলে ভাল।

দুর্বার রবীন্দ্রমোহ সত্ত্বেও বুদ্ধদেববাবু স্বরবৃত্তের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সাময়িক পক্ষপাত উল্লেখ করতে দ্বিধা না করে সত্যিকারের সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। পয়ারকে একটা ছন্দোবন্ধ মনে না করে একটা ছন্দ, (বিশেষ জাত না হোক, বিশেষ ঢংএর ছন্দ) বলবার সপক্ষে যে কারণ দেখানো হয়েছে তাতে অনেকেরই সমর্থন

আশা করা যায়। এক সময়ে যখন মূলত একই ছন্দ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হোত, প্রতি পংক্তিতে পর্ব্বসংখ্যাই ছন্দের বৈশিষ্ট্য বিবেচিত হতে পারত। কিন্তু আধুনিক কাব্যে নানা বিচিত্র ঢংএর ছন্দে পংক্তির পর্ব্বসংখ্যাকে বড় একটা বৈশিষ্ট্য মনে করা হয় না—বিশেষ ভাবের প্রতীক হিসেবে বিশেষ পর্ব্বসংখ্যাবিশিষ্ট পংক্তির উপরেই নির্ভর করা হয় না।

আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো 'বাউল গানের ছন্দে'র উপর যেটুকু আলো ফেলা হয়েছে। অমূল্যধনবাবুর ছন্দ বিষয়ক সব আলোচনার মধ্যে মাত্র যে দু'একটির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলবার মত কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি ছড়ার ছন্দে পর্ব্বের দৈর্ঘ্যবৈচিত্র্য তার একটি। কেবলমাত্র চারমাত্রার পর্ব্বই ছড়ার ছন্দে চলতে পারে এর ক্ষীণ প্রতিবাদ নিয়ে অনেক তিনমাত্রার পর্ব্ব আমার মনে উঁকি দিয়েছে এবং স্বয়ং অমূল্যধনবাবুকেও আমি বছর দুই আগে কঙ্কাবতী থেকে

মুখে মুখ রাখিই যদি এমন আর দোষ কী বল
মনেরে যায় না ছোঁয়া কেমনে চাখবো তারে···

ইত্যাদি তুলে পাঠাই যা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে তিনি তখনই স্বীকার করেন। অতুলপ্রসাদ এবং আরো অনেকের গানে, ছড়ায়, কবিতায় তিন আর চার মাত্রার পর্ব্বের সুন্দর মিশ্রণ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

প্রবন্ধটির সপ্তম অনুচ্ছেদের বিষয়টিও আলোচনার বিশেষ উপযোগী। অবশ্যি এ নিয়ে এখনই বেশী কিছু বলে ফেলা কঠিন, যদিও ছান্দসিকেরা অনেকদিন থেকেই বিষয়টি চিন্তা করছেন। আপাতত মনে করতে পারি প্রথম দিকের দৃষ্টান্তগুলিতে প্রতিটি ধ্বনি পূর্ণমূল্য পাচ্ছে বলে ধ্বনিমাত্রিক ছাঁদে আবৃত্তিই সহজ স্বাভাবিক; যদিও কোনো কোনোটি আকৃতিগত বা শব্দসংযোজনজাত বাধা না থাকায় অন্য ছাঁদে আবৃত্তিকেও প্রশ্রয় দিতে পারে। তা সে যে ভাবেই হোক, আবৃত্তিতে পরিচিত তিনটি ঢংএর একটি নিশ্চয়ই বজায় থাকবে। আর তাই একে বিশেষ কোনো নতুন ঢংএর দৃষ্টান্ত বলবার সার্থকতা থাকে না।

সবশেষে গদ্যছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার যে স্পষ্টতা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, এক রবীন্দ্রনাথেই তা আশা করা সম্ভব, আমি ত আর কাউকে এ মহলে বেশী আলো ফেলতে দেখিনি। গদ্যছন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখযোগ্য আলোচনার মধ্যে অমূল্যধনবাবুর প্রবন্ধটি মূলত আকৃতিগত। আবার রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্যছন্দের প্রকৃতি বুঝিয়ে দিতে ভাবছন্দ কথাটির আমদানি করলেন তখনও একরকম

অস্পষ্টতা থেকে গেল হয়ত—কারণ ভাবছন্দ কথাটির দু'তিনরকম ব্যাখ্যা সম্ভব। অমূল্যধনবাবু যে 'অর্থবিভাগে'র উল্লেখ করেছেন সে কি ঐ ভাবচ্ছন্দেরই অনুসরণে? অনেকদিন মন প্রশ্ন করে উঠেছে। এ প্রবন্ধে ভাবছন্দের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে আমার বিশ্বাস সত্যিকারের কাব্যবোধসম্পন্নের পক্ষেই তা পরিবেশন করা সম্ভব। গদ্যছন্দের অন্তত একটি ভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় এখানে পাওয়া গেল। শুধু গদ্যকাব্যের নয়, পদ্যকবিতায়ও যে ভাবছন্দ বর্ত্তমান, পদ্যের ছন্দোরীতির মধ্যে ভাবছন্দই যে লীন হয়ে থাকে একথাটি নতুন একটি চিন্তার দোর খুলে দিল। বুদ্ধদেববাবু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিচিত পংক্তির নতুন মাধুর্য্য লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছি—আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ, যে থাকে থাক না দ্বারে, তোরা যে যা বলিস ভাই, আমি যতবার আলো জ্বালাইতে চাই নিভে যায় বারে বারে, আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে, ভ্রমর ওরে ভ্রমর তুই একটু চুপ কর, যত পংক্তি মনে ভিড় করে আসছে পদ্যছন্দের মহিমা আরও বেশী উপলব্ধি করছি তার ভাবানুবর্ত্তিতা লক্ষ্য করে। এ নিয়ে অবশ্যি প্রশ্ন উঠবে এর পর, পদ্যে ছন্দোরীতির মধ্যে ভাবছন্দ কি ভাবে মিলিয়ে থাকে, পদ্যছন্দ যে ভাবছন্দকে অনুসরণ করে সে কি প্রক্রিয়ায়, গদ্যছন্দকে যে অর্থে বলব ভাবছন্দের অবিকল প্রতিরূপ সে অর্থে পদ্যছন্দকে কি বলব, গদ্যছন্দ পদ্যছন্দ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে যে-কোনো ভাবের অনুসরণ করতে পারে কিনা এবং আরো অনেক। এ সব অনেক ভাববার কথা আছে পরে। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে যে কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে অর্থাৎ পদ্যছন্দ হোক কি গদ্যছন্দ, দুয়েরই কাজ ভাবছন্দের প্রতিরূপ সৃষ্টি, সেইটিই আমাদের আপাতত পরম লাভ।

তাপসকুমার ভৌমিক

ভ্রম-সংশোধন

'কবিতা'র আশ্বিন সংখ্যার 'আলোচনা' বিভাগে 'বাংলা ছন্দ' বিষয়ে দ্বিতীয় নিবন্ধটির লেখকের নাম মোফাজ্জল হায়দর। ভ্রমক্রমে মোয়াজ্জল হায়দর ছাপা হয়েছিল।

সমালোচনা

ক্রান্তি (শারদীয় সংকলন) ক্রান্তিভবন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও অমৃতকুমার দত্ত সম্পাদিত। দেড় টাকা।

কয়েকটি কবিতা। শামসুল হুদা সম্পাদিত। নুর লাইব্রেরী কলকাতা। দু টাকা।

সাত সতেরো। সম্পাদক সুধাংশু চৌধুরী। বরিশাল থেকে আবুল কালাম শামসুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত। আট আনা।

অগুন্তি সংকলন গ্রন্থ বেরোচ্ছে আজকাল। তার মধ্যে অধিকাংশই পড়ে ওঠা যে-কোনো পাঠকের পক্ষে শারীরিক কারণেই অসম্ভব। বলাই বাহুল্য যে তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা ভালোমন্দ কিছু রচনাকে কোনোরকমে একত্র ছাপিয়ে বের করলেই সংকলন হয় না। সংকলনের পিছনে সাহিত্যরসিক যে বিশিষ্ট মনটি কাজ করে তার পারদর্শিতার উপরেই সংকলনের সার্থকতার অনেকখানি নির্ভর। এক্ষেত্রে সম্পাদকের দায়িত্ব যে-কোনো লেখকের চেয়ে কম তো নয়ই, বোধ হয় বেশী। সার্থক সংকলনগ্রন্থের উত্তরখণ্ডগুলিও পরপর যাঁরা পাঠ করেন তাঁরাই সেকথা জানেন।

প্রভূত প্রকাশের মধ্যেও 'ক্রান্তি' উৎসাহী পাঠকের মন আকৃষ্ট করবে কেননা সুদৃশ্য এই সংকলনটি, কলকাতা নয়, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। আজ পর্যন্ত সাহিত্য শিল্প রুচি বৈদগ্ধ্যের অদ্বিতীয় কেন্দ্র তো কলকাতাই। অনিবার্য্য হ'লেও এ ঘটনা দুঃখের। মনে হয় কলকাতার বাইরে সারা দেশটাই যেন জঙ্গল। মাঝে-মাঝে মফস্বলে যে সব সাহিত্যবাসরের অধিবেশনে কলকাতা থেকে সংবাদপত্র-সম্পাদক বা রাজনৈতিক বক্তারা গিয়ে মহাসম্মানীয় অতিথি হ'য়ে ফিরে আসেন তাঁদের কথা স্মরণ রেখেই একথা বলছি। বাংলা সাহিত্য-শিল্পের একটি প্রাণবান উপনিবেশ কি আর কোথাও গ'ড়ে উঠবে না—এই বলে যাঁদের ক্ষোভ ছিল তাঁরা হয়তো ঢাকার 'ক্রান্তি'র দিকে তাকিয়ে আশা রাখবেন। কিন্তু যাঁদের লেখা এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে দেখছি তাঁরা অনেকেই খ্যাতনামা। অগ্রজ আধুনিক বাঙালি কবিদের প্রায় সকলেই উপস্থিত। প্রত্যেকটি নিমন্ত্রণের আসরে সব ক'টিই চেনা মুখ দেখলে বেশীদিন ভাল লাগে না। যাই হোক, আমার কাছে এ সংখ্যার এই কবিতা কটিই ভালো মনে হোলো। নবীন ঔর্দ্দু গাল্পিক কিষণচন্দরের

অনুবাদটি এবং গোপাল হালদার মশাইর "জাগরী" উপন্যাসের দীর্ঘ আলোচনাটিও ভালো। কিন্তু তাছাড়া অধিকাংশ প্রবন্ধই দুর্ব্বল। তাহলেও সবটা মিলিয়ে উপভোগ্য রচনার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। 'ক্রান্তি'র যে প্রতিশ্রুতি আছে নবীনতরদের নিয়ে পরবর্ত্তী সংগ্রহে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব সম্পাদকের।

একটা কথা। একাধিকবার অল্ডস হক্সলির প্রতি আক্রমণ চোখে পড়লো। বিশেষ প্রবন্ধলেখকের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা এখানে সম্ভব না হলেও সাধারণ-ভাবেই বলছি, 'বিশেষ' কোনো একটি মতবাদে হক্সলির আস্থা নেই বলেই কি এ আক্রমণ? কিন্তু এ কথাই কি সত্য নয় যে লেখক যদি তাঁর প্রতিভার প্রতিশ্রুতি সত্যই রক্ষা করেন তাহ'লে 'বিপ্লবের পথে, কর্মের পথে পা না বাড়িয়ে' তিনি নিত্য নূতন রচনার পথেই পা বাড়াবেন? সেইটেই তো তাঁর 'কর্ম'। 'ধ্যানধারণা' (?) এবং 'গীতায় মনোনিবেশ' সত্ত্বেও (কিন্তু 'সত্ত্বেও'ই বা কেন?) হক্সলি যে একজন আশ্চর্য্য শিল্পীই আছেন—তাঁর অধুনা প্রকাশিত *Time Must Have a Stop* উপন্যাসই তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

'কয়েকটি কবিতা' শুধু মুসলমান কবিদের একটি সংগ্রহ। যে কবিদের রচনা সংগৃহীত হয়েছে তাঁদের অধিকাংশ কবিই 'এক সময়ে ঢাকার "মুস্লিম সাহিত্য সমাজের" সভ্য ছিলেন' বলে কাজি আবদুল ওদুদ সাহেবের পরিচিতি থেকে জানা গেল। সে হিসাবে সংকলনটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য থাকা সম্ভব। নাহলে বিশেষ ক'রে এক সম্প্রদায়ের কবিদের সংগ্রহ বলে আমার ক্ষীণ কণ্ঠেও আমি আপত্তি জানাতুম। কবিদের শিল্পীদের যে কোনো জাত নেই একথাও কি নতুন করে বলবার? কাজি সাহেব লিখেছেন—'তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পর (বিশ্ববিদ্যালয়ের) মুস্লিম হলে সাহিত্য সমাজের অধিবেশন নিষিদ্ধ হয় এবং এর প্রতি মুসলমান সমাজের ব্যাপক বিরোধিতা প্রবল আকার ধারণ করে প্রতিপক্ষের এই প্রচারের ফলে যে এই "সমাজ" মুসলমানের ধর্ম ও সমাজ নষ্ট করছে। সেই বিরোধিতার ইতিহাস দীর্ঘ, করুণ ও কৌতুককর।' এই বেদনাদায়ক ঘটনাই তো প্রমাণ করে যে কবিদের কোনো জাত নেই। কিংবা তাঁদের একমাত্র জাতের পরিচয়—তাঁরা নির্ভেজাল মানুষ। সমাজের ছোটো ছোটো ঘাঁটি আগলাতেই যারা ব্যস্ত তারা তাই কবিদের চিরকালই শত্রু মনে করে এসেছে। অথচ পরিচিতি থেকেই জানা গেল—'বুদ্ধির মুক্তি' ও 'জীবনের অশেষ সম্ভাবনা'—

এই দুইটি বাণীই এই কবিগোষ্ঠীর সম্মুখে ছিল। এবং 'কোরানের ইসলামের ক্লৈব্যবর্জিত অগ্রগতির সাধনার সঙ্গে এর নিবিড় যোগ' আছে।

একটি বিশেষ কবিগোষ্ঠীর পরিচিতি হিসাবে 'কয়েকটি কবিতা'র মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু কাজি সাহেবের কথা উদ্ধৃত করেই বলি— 'কাব্যকলার দিক দিয়ে নিখুঁত কবিতার সন্ধান যাঁরা করবেন তারা মোটের উপর হতাশ হবেন।' কথাটি সত্য। এবং তাই যদি হয় তাহ'লে এ গ্রন্থের প্রতি সাধারণ পাঠকের আকৃষ্ট হবার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু গ্রন্থের এখানে ওখানে কয়েকটি ভালো কবিতাও ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলি খুঁজে নিতে পাঠকের কষ্টই হবে।

বরিশাল থেকে আর একটি ছোটো কবিতার সংকলন বেরিয়েছে 'সাত সতেরো'। এগারো জন কবির উনিশটি নাতিদীর্ঘ কবিতা। কবিরা সকলেই নবাগত নন। শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিমল ঘোষ, এমনকি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকেও পাওয়া গেল। কবিতা পত্রিকা বলেই ভুল হোতো। কিন্তু পূর্বপ্রকাশিত কবিতাও চোখে পড়লো ব'লে মনে হচ্ছে সংকলন। কিন্তু এত ক্ষুদ্র?

বয়োজ্যেষ্ঠদের কবিতা অন্তর্ভুক্ত করার একটা দুর্বল অ্যাপলজি সম্পাদকের ভূমিকায় আছে। কিন্তু সাধারণ সংকলন যখন নয় তখন তাঁদের না নিলেই হোতো। কাব্যের আসরে প্রবেশ করার জন্য কোনো পাসপোর্টেরই তো প্রয়োজন নেই। 'সাত সতেরো'র কয়েকটি কবিতা ভালো, আশা হয় নবাগতরা আরো ভালো কবিতা লিখবেন। জীবনানন্দকে অন্তর্ভুক্ত করে ভালোই হয়েছে। কেননা জীবনানন্দীয় রোমান্টিকতার আবহাওয়াতেই এ কবিগোষ্ঠীর অনেকে পরিপুষ্ট। আমাদের 'নির্জনতম কবি'কে কেন্দ্র ক'রে বরিশালে একটি আসর গড়ে উঠলে তো ভালোই। আবুল কালামের—

উত্তর করিল না কেহ
পৌষ রজনীর চারিদিক ভরা আত্মারা বিদেহ

নিশ্চয়ই ছন্দপতন?

অন্তরঙ্গ। বিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কবিতাভবন। চার আনা।

'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় আর-একখানি গ্রন্থ সংযোজিত হলো। এই গ্রন্থমালাতেই যে কয়েকজন কবি তাঁদের প্রথম কবিতার বই প্রকাশ করেছেন বিভূতিপ্রসাদ বাবু তাঁদের একজন।

প্রথম যখন 'একপয়সায় একটি' বের হয়েছিল খুব একটি সাড়া পড়ে গিয়েছিল কবিতার পাঠকমহলে। গ্রন্থমালার নামকরণে পাঠকদের প্রতি যে বিদ্রূপের ইঙ্গিত

ছিল না তা বলতে পারি না। কিন্তু আধুনিক কবিজ্যেষ্ঠদের একাধিক কবিতা এত সুলভমূল্যে পেয়ে উৎসুক পাঠকেরা খুব খুশী হয়েছিলেন। বিদ্রূপটা তাঁদের গায়ে লাগেনি। অথবা বিদ্রূপটা আসলে যাঁদের প্রতি তাঁরা এতে বিচলিত হন নি। আধুনিক প্রধান কবিদের রচনা পাঠকসমাজে এভাবে পরিচিত করিয়ে দেওয়াতেই 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা প্রকাশের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল বলা চলে।

কিন্তু যে কবিরা প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে প্রয়াসী তাঁদের পক্ষে 'একপয়সায় একটি'র মতো ছোট বই প্রকাশ না করাই বোধ হয় ভালো। ক'টা কবিতাই বা ষোলো পৃষ্ঠায় ধরে। একটু দীর্ঘ হ'লে ষোলোটি কবিতাও না। আর এত কম কবিতা পাঠ ক'রে সাধারণ পাঠকের পক্ষে নতুন কবির সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে ওঠা কঠিনই। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে সে-ব্যতিক্রম ক'টি?

বিভূতিপ্রসাদবাবুর কবিতা ক'টি আমার ভালো লেগেছে। কবিমাত্রই নির্জন। বিভূতিপ্রসাদ বাবু নির্জনতর, যেমন জীবনানন্দ দাশ। দলমার পাহাড়ের কোলে, নিরালা গাছের ছায়ায়, শাল সেগুনের বনে, হেমন্তের শিশির-শীতল নদীতীরে, যেখানে

এলোমেলো পাতার আড়ালে
রূপালী শঙ্খের বাঁকা চাঁদ
... ...
উত্তর হাওয়ায় কাঁপে কালো কালো পাতার আড়ালে।

কিংবা যেখানে ধানকাটা মাঠে

বনের চড়ুই আর অচিন পাখীরা মাঠে আসি
ছড়ানো ধানের গন্ধে ঘুরে ফেরে

সেইখানে ঘরছাড়া বহিঃপ্রকৃতিবিলাসী তাঁর মন ঘুরে বেড়ায়। জীবনানন্দর উল্লেখে করেছি। আধুনিক অনেক বাঙালি কবির উপরেই তাঁর ছাপ আছে। বিভূতিবাবুকে প'ড়ে সেকথা আরো বেশী ক'রে মনে হোলো। প্রভাব সার্থক হ'লে তা মঙ্গলকরই হয়।

অনেক নির্জন ছবি তিনি এঁকেছেন। মাঝে মাঝে দুএকজায়গায় সুর কেটে গেছে। যেমন

হিজল গাছের ছায়ায় অরণ্যের কি এক বিস্ময়
নিয়ে এলো সূর্য্যাস্তের আকাশের রৌদ্রের সৌজন্যে—

তাঁর পরবর্ত্তী রচনায় কোনো অভিযোগের কারণ তিনি রাখবেন না আশা করি।

আগামী কালের কবিতা। রমাপতি বসু। দেড় টাকা।

আমার দেশকে আমি ভালোবাসি। ফল্গু কর। এক টাকা।

কবিতা পড়বো অথচ সে কবিতা ভালোবাসতে পারবো না, থেকে থেকে তার বিচ্ছিন্ন কোনো পংক্তি মনে ঘুরে ফিরে আসবে না এ বড় নির্দয় শাস্তি। কবিতা লেখার মতো কবিতা পড়াও যাদের দুরারোগ্য ব্যাধি তারাই তো কবিতা পড়ে?

কবিতা পড়ার জন্য কারো কোনো মাথার দিব্যি নেই যেমন নাকি খবরের কাগজ পড়ার জন্য আছে। কোনো কবির এক লাইন না পড়েও, এমনকি রবীন্দ্রনাথের দুচারটি স্কুলে পাঠ্য কবিতা পড়েই যে-কোনো ভদ্রলোক সম্মান কুড়িয়ে আয়েসে এলিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন। কবিতা পড়ার অভ্যাস যাঁদের আছে, তাঁদের পক্ষে, তাই, কোনো কবিতা ভালোবাসতে না পারা কঠিন শাস্তি।

'আগামী কালের কবিতা'র বইএর জ্যাকেট থেকে জানা গেল কবি ইতিমধ্যেই 'বিপ্লবী কবি' বলে স্বীকৃত। তিনি যে বহুবার কারাবরণ করেছেন তাও জানা গেল। প্রেসিডেন্সি জেলে ব'সে লিখিত কটি কবিতাও এ বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় খুব কম লেখাই এ বইয়ে আছে যা পুরো কবিতা হয়ে উঠেছে। ভাষাব্যবহারের শৈথিল্য এবং ছন্দপ্রমাদ অনেকবার চোখে পড়লো। নির্ভেজাল সাংবাদিক কথাবার্তাও কবিতার অন্তর্গত করা হয়েছে।

রাজাজী হাজির এক নিয়ে প্রস্তাব,
বিবাদী নেতার মুখে বিজয়ের গান—
অস্ত্রোপচার হবে ভারতের পর
নাহ'লে আপোষ নেই। স্পষ্ট জবাব!

কিংবা

হাজার হাজার বুটের নিষ্পেষণে
পৃথিবীর প্রতিচ্ছবির রূপান্তর ঘটছে
নাৎসীজ্‌মের জৌলুষে—ইত্যাদি

এও কি কবিতা? নারী, অভিব্যক্তি, কাঠবিড়ালী, বুরুজ প্রভৃতি কবিতা কটি ভালো হ'তে পারতো। কর্মীর জীবন এবং কবির জীবনে দুরতিক্রম্য একটা দ্বন্দ্ব র'য়ে গেছে বলেই কি হ'তে পারে নি? একথা বললুম কেননা

এলো লোনা জল আলকে এলিয়ে দিয়ে—

এমন ভালো লাইনও এ বইয়ে আছে।

শ্রীযুক্ত ফল্গু করের ছন্দের হাতটি মিষ্টি। অনেক রকম ছন্দ নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন। সতেজ পরিচ্ছন্ন একটা প্রকাশের ভঙ্গী চোখে পড়ে। কিন্তু তিনি বিশেষ ক'রে তরুণ পাঠকদের উদ্দেশ ক'রে কবিতাগুলি লিখেছেন। ফলে অনেক কবিতাতেই তাঁকে উচ্চকণ্ঠ হ'তে হয়েছে এবং যা কবিতার কাজ নয় সেই মরাল প্রচারের কাজেও কবিতাকে তিনি লাগিয়েছেন। তাঁর প্রথম বই তরুণদের উদ্দেশে। তাঁর পরবর্তী রচনা সকলের উদ্দেশে হবে আশাকরি।

নরেশ গুহ

সম্পাদক ও প্রকাশক : বুদ্ধদেব বসু
কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
১৮ বৃন্দাবন বসাক স্ট্রীট দি ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ডারি এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিঃ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, বি. এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত

কবিতাভবন প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর বই

১. **কঙ্কাবতী** ও অন্যান্য কবিতা। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, **দুই টাকা চার আনা।**

২. **সমুদ্রতীর।** (বর্তমানে ছাপা নেই)।

৩. **এক পয়সায় একটি।** বিখ্যাত গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তিকা। ষোলো পৃষ্ঠায় ষোলোটি লঘু রসের কবিতা। **চার আনা।**

৪. **২২শে শ্রাবণ।** (বর্তমানে ছাপা নেই)।

৫. **সব-পেয়েছির দেশে।** রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ। দ্বিতীয় সংস্করণ। **এক টাকা বারো আনা।**

৬. **নতুন পাতা।** গদ্যকবিতাসংগ্রহ। প্রেমের কবিতা, প্রকৃতির কবিতা, বিদ্রূপের কবিতা, এই তিন ভাগে বিভক্ত। **দুই টাকা।**

৭. **দময়ন্তী** ও অন্যান্য কবিতা। ১৯৩৫—১৯৪২-এর রচনা থেকে নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ। **আড়াই টাকা।**

৮. **বিদেশিনী।** একটি দীর্ঘ কাহিনী কবিতা। **আট আনা।**

৯. **মায়া-মালঞ্চ।** লেখকের 'কালো হাওয়া' উপন্যাসের নাট্যরূপ। কবিতাভবনের প্রযোজনায় অভিনীত। **দেড় টাকা।**

১০. **রূপান্তর।** ১৯৪৪-এর রচনা থেকে নির্বাচিত কয়েকটি কবিতা। অধিকাংশই পূর্বে অপ্রকাশিত। **পরিমিত সংস্করণ, প্রত্যেক কপি সংখ্যাযুক্ত ও লেখককর্তৃক স্বাক্ষরিত। পাঁচ টাকা।**

১১. **একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা।** একটি দীর্ঘ গল্প। 'ছোটোগল্প' গ্রন্থমালার অন্তর্গত। **আট আনা।**

১২. **উত্তরতিরিশ।** ১৯৩৭—৪৪-এ রচিত 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধ-সমষ্টি। **সাড়ে-তিন টাকা।**

১৩. **গল্পসংকলন।** (১৯২৮-১৯৪৫)। লেখকের এ-যাবৎ প্রকাশিত সমস্ত গল্প থেকে নির্বাচিত আঠারোটি বিভিন্ন ধরনের গল্পের সমাবেশ। আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত। রয়্যাল আট পেজি আকারে ৩০০ পৃষ্ঠার ঊর্ধ্বে সুবৃহৎ গ্রন্থ। কাগজের মলাট **পাঁচ টাকা।** কাপড়ে বাঁধাই, স্বর্ণাক্ষরে নামাঙ্কিত, **ছ' টাকা চার আনা।**

১৪. **কালের পুতুল।** সমালোচনা-প্রবন্ধের সংগ্রহ। সমসাময়িক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ। **চার টাকা।**

১৫. **বিশাখা।** নতুন উপন্যাস। **আড়াই টাকা।**

কবিতাভবন: ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

বুদ্ধদেব বসু
সম্পাদিত

বৈশাখী
বার্ষিকী

= ১৩৫৩ সংখ্যায় লিখেছেন =

অন্নদাশঙ্কর রায়
অমিয় চক্রবর্ত্তী
আরতি রায়
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
নরেশ গুহ
"পরশুরাম"
পরিমল রায়
প্রতিভা বসু
পৃথ্বীশ রায় চৌধুরী
বুদ্ধদেব বসু
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
হেমচন্দ্র বাগচী

দেড় টাকা

বৈশাখী ১৩৫১, ৫২ ও ৫৩
প্রতি খণ্ড দু'টাকা

বুদ্ধদেব বসু-র
নতুন বই

কালের পুতুল

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের
সমালোচনা

এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ
সন্নিবিষ্ট হয়েছে :

লেখার ইস্কুল
কবির জীবিকা
প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য
'কল্লোল' ও দীনেশরঞ্জন-দাশ
জীবনানন্দ দাশ
সমর সেন
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
বিষ্ণু দে
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
অমিয় চক্রবর্ত্তী
নিশিকান্ত
অন্নদাশঙ্কর রায়
দু'জন তরুণ মৃত কবি
নজরুল ইসলাম
কালের পুতুল

চার টাকা

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা ২৯